প্রকাশক :
বিষ্কলেন্দু চক্রবর্তী, বি. এ., সাহিত্যভারতী
প্রতিমা পুস্তক
১৩৯-ডি-১, আনন্দ পালিত রোড,
কলিকাতা-১৪।

প্রথম প্রকাশ :
১০ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭ সন।

বিক্রয় কেন্দ্র :
প্রতিমা পুস্তক
১৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯।

প্রচ্ছদপট শিল্পী :
অধ্যাপক তরুণ দাস
রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
(সৌজন্যে প্রাপ্ত)

মুদ্রক :
অন্নপূর্ণা প্রেস
৩৩-ডি, মদন মিত্র লেন,
কলিকাতা-৬।

দাম :
তিন টাকা (৩·০০)

॥ উপহার ॥

॥ উৎসর্গ ॥

নাট্য জগতে আমার অন্যতম পথ নির্দেশক
রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন (মানবতা বিভাগ)
ডঃ সাধন কুমার ভট্টাচার্য, মহাশয়—
শ্রদ্ধাভাজনেষু।

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

বার বছর বয়েস থেকে ঘর ছাড়া হয়ে পথে পথে ঘুরচি। বিচ্ছিন্নভাবে আঁকাবাঁকা পথে চলতে চলতে জীবনের কাছে বার বার মার খেয়েচি। কোন ক্ষমতা বা কোন নিয়মের অনুশাসনে কেউ আমায় বাঁধতে পারেনি। তাই কেবল পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েচি। অবশেষে আপনার সস্নেহ শাসন পেয়ে নিজেকে একটু একটু করে চিনতে শিখেচি। আর চিনতে শিখেচি নাটককে। নাটক লিখেচি। আপনি দেখেচেন। দেখে রেগেচেন। তীব্র ভর্ৎসনা করেচেন। বলেচেন—কিচ্ছু হয়নি—তোর দ্বারা হবে না; তুই লিখিস্ না; যত সব আবর্জনা! আপনার এই শাসন আমি মানিনি। বরং আপনার কথায় আমার মধ্যে নতুন উদ্দীপনা এসেচে। নিজে জানি এগুলো কিছুই হয়নি। যে আবর্জনার সৃষ্টি করেচি তার মূল প্রেরণা আপনিই। তাই এইগুলোকে আপনার হাতেই তুলে দিলাম। খুসী মনে নেবেন। আর না নিলে বলবো—বেশ তো ছিলাম, এত স্নেহ ভালবাসা দিলেন কেন?

আপনার একান্ত অনুগত,
শ্রীমান।

—ঃ সপ্তকের সাতটি নাটক ঃ—

॥ আমার কথা ॥

আমার নাটক'ই আমার কথা। এছাড়া আরো কিছু বাড়তি কথা আছে। সেই বাড়তি কিছু কথা আমি বলতে চাই। এটা কোন পাণ্ডিত্যের কথা নয়। সহজ স্বাভাবিক কথা—নিতান্ত অপণ্ডিতেরই কথা। নাট্য-জগতে, বিশেষ করে নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে এই 'আমার প্রথম আবির্ভাব। সেই কারণে ভুলত্রুটী অনেক আছে। এবং সেই ভুলত্রুটীর ক্ষমাও নিশ্চয়ই আছে। কাজেই সর্ব প্রথমে সেই ভুলত্রুটীর জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবো। শুধু সেটুকুতেই শেষ নয়। আরো কিছু আশা করবো। প্রীতি-শুভেচ্ছার সাথে সাথে আমার নাটক সম্পর্কে ব্যক্তিগত ভাবে আলোচনাও আশা করবো। যা দিয়ে আমি ভবিষ্যতে নিজেকে সংশোধন করতে পারবো। আশা করি এবিষয়ে গুণীজনদের সাড়া পাবো।

প্রায় আট বছর ধরে আমি বাংলা নাট্যমঞ্চের সঙ্গে যুক্ত। বহু জায়গায় বহু চরিত্রে আমি অভিনয় করেছি ; বহু নাটকও আমি দেখেছি। অভিনয় করতে করতে যেটা মনে হয়েচে তাতে করে একাংক নাটক লেখার প্রয়োজন অনুভব করেছি। আজকের এই অস্থিরতার যুগে মানুষের হাতে সময় নিতান্ত অল্প। এই অল্প সময়ে মানুষ পেতে চায় কিছু বেশী। এই যুগ-মানসের তাগিদেই একাংক নাটক লেখার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়েছে। কেন হয়েছে তার বিশেষ কোন তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আমার কাছে নেই।

বাংলা দেশের বর্তমান নাট্য আন্দোলন কয়েকটা শহুরে সংস্থা'র মধ্যেই সীমিত। অবশ্য ব্যবসায়িক মঞ্চ সংস্থার কথা আমি বলতে

চাই না। যাঁরা নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন এবং যুক্ত হয়ে নতুন কিছু চিন্তা ভাবনা দ্বারা কিছু না কিছু করার চেষ্টা করছেন, তাঁরা অনায়াসেই ধন্যবাদের পাত্র। আর এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলশ্রুতি হিসেবে ভাল-মন্দ মিশিয়ে কিছু না কিছু কাজ যে হচ্ছে, তা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু এখানে আমার মনে একটা প্রশ্ন জেগেছে। সেই প্রশ্নটা হচ্ছে—বাংলা দেশে নাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে বাংলা মৌলিক নাটক কৈ? মাফ্ করবেন, আমি কোন ঈর্ষাবশে কোন শ্রেণী বা ব্যক্তির প্রতি কটাক্ষ করতে চাইচি না। আমি যা দেখেচি বা আমার যা মনে হয়েচে সেটুকুই কেবল বলচি। অবশ্য আমার এই মনে হওয়া বা দেখা ভুলও হতে পারে। যাই হোক, যা দেখচি সেটুকু অনেকটা এই রকম—আমাদের নাট্য-আন্দোলন শহরকেন্দ্রিক আন্দোলন। এই শহরের কয়েকটি সংস্থা—যাদের মধ্যে বেশ প্রগতিশীল মনোভাব আছে বলে মনে হয়—নিদেন পক্ষে কিছু না কিছু করতে পারার মত ক্ষমতা তাঁদের আছে—সেই রকম কয়েকটি সংস্থার নাটক নির্বাচনে দেখা যাচ্ছে যে তাঁরা পুরাতনের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন। নতুবা বিদেশী নাটককে ভাবান্তর-রূপান্তর ঘটিয়ে কিছু কিছু কাজ করছেন। কিন্তু তাতে করে আজকের বাংলা দেশের নাট্য আন্দোলনের বিশেষতঃ নবনাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে কি কাজ হচ্ছে? আমার এই কথার প্রত্যুত্তরে এই রকম একটা অভিযোগ আসতে পারে -- বাংলা দেশে নাট্যকার কৈ? অথবা বাংলা দেশে নাটকই নেই। এখন, এই রকম প্রশ্নের জবাব দেবার প্রয়াস নানান আলোচনার অপেক্ষা রাখে। বাংলা দেশে নাটকও আছে নাট্যকারও আছে—তবে নানান কারণে হয়তো তাঁরা পিছিয়ে পড়েছেন নতুবা আজকের আন্দোলন নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামাচ্ছেন না। যাইহোক, এই সমস্ত আলোচনার কিছু কিছু জবাব আমার "বাংলা নাটকের কালান্তর" গ্রন্থে দেবার চেষ্টা করেচি। দিন এলে সকলের সমর্থন এবং সাড়া পেলে আমি নিজেই কিছু প্রমাণ করতে পারবো যে বাংলা দেশে নাটক আছে। এবারে কৃতজ্ঞতা স্বীকারের পালা।

আজকের এই নাটকগুলো লেখার পেছনে যাঁরা আছেন—এই মুহূর্তে সকলের নাম মনে পড়ছে না—সেই সব অগণিত শিল্পী-সাহিত্যিক-শিক্ষক বন্ধুরা—যাঁরা আমাকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে নানান সাহায্য করেছেন তাঁদেরকে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর যাঁদের অনুপ্রেরণা আমার সাহিত্য জীবনের চলার পথে পাথেয় হয়ে রয়েচে তাঁদের মধ্যে আমার নাট্যগুরু অহীন্দ্র চৌধুরী, ডঃ সাধন কুমার ভট্টাচার্য, ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, ডঃ অজিত ঘোষ, শ্যামমোহন চক্রবর্তী, সুধাংশু সান্যাল, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, তরুন দাশ, রঘুনাথ প্রসাদ প্রভৃতি অধ্যাপকবৃন্দকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাই। আর প্রণাম জানাই আমার সেই সুদূরের প্রবাসী মা শ্রীমতী হেনা বসুকে।

প্রত্যক্ষ ভাবে প্রুফ দেখার কাজে, ছাপার কাজে এবং পাণ্ডুলিপি কপি করে দেবার কাজে যারা আমায় সাহায্য করেছেন এবং করছেন তাদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় অবনীকান্ত ভট্টাচার্য (জামাইবাবু) বাদলদা, নরেন হাজরা, শিবনাথ সাহা এবং আমার স্নেহের ছাত্রী দীপিকা রায়, আরতি সরকার, সিপ্রা সাঁতরা ইত্যাদি সবাইকে আমার কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বিনীত,

নাট্যকার

৪৪, শরৎ চ্যাটার্জী রোড,
বরাট কলোণী,
কলিকাতা—২৮।

॥ **অগ্নিদূতের পরবর্তী গ্রন্থসমূহ** ॥

বাংলা নাটকের কালান্তর	(আলোচনা)
নাটকের শিল্প-রীতি	,,
পান্না—হীরা—চুনি	(গল্প-গ্রন্থ)
এই শহরের পথে ঘাটে	,,
অল্প কথা—গল্প নয়	,,
রক্ত পিছল পথে	(নাটক)
লৌহগড়	,,
ফলশ্রুতি	(উপন্যাস)

॥ ভূমিকা ॥

'সপ্তক'-এর সাতটা নাটকই পড়লাম। ভূমিকা লেখার আগে নাট্যকার সম্পর্কে ব্যক্তিগত ভাবে দু'চারটে কথা বলতে চাই। কেননা, প্রত্যক্ষ আর পরোক্ষভাবে হোক—কোন না কোন প্রকারে, যে-কোন সাহিত্যিকের জীবনই হচ্ছে তাঁর সাহিত্য। কাজেই ব্যক্তি-জীবনকে উপেক্ষা করে নিছক সাহিত্যের মূল্যায়নই সব বিচার নয়। নাট্যকারকে তার আসল নামে লিখতে বলায় সে আপত্তি তোলে। ছদ্ম নামের আশ্রয় নেয়ার পেছনে যে যুক্তি সেটা বোধকরি নাট্যকারের ব্যক্তিতত্ত্ব-নির্ভর যুক্তি। নাট্যকারের আসল নাম যাই হোক না কেন, নাট্যকারের নাটকই তার আসল পরিচিতি —অন্ততঃ আমাদের কাছে। তাছাড়া সেকস্‌পীয়রের কথার প্রতিধ্বনি করে বলবো—নামে কি এসে যায়!

বিনা সংকোচে এবং বিনা দ্বিধায় বলছি—জ্ঞানতঃ আমার যতদূর মনে হয়, বাংলা দেশে (প্রতিষ্ঠিত) বর্তমান নাট্যকারদের মধ্যে—বয়েসের দিক থেকে শ্রীমান অগ্নিদূতই কনিষ্ঠতম। সবচেয়ে বড় কথা—এই তরুণ নাট্যকার আমার বিশেষ প্রীতিভাজন ছাত্র। সে আমার কাছে মূলতঃ অভিনয় বিষয়ে কিছু শেখে। আর অভিনেতা হিসেবে তার মাঝে আমি আশার আলো দেখেছি। সব চাইতে আশ্চর্য লাগলো সেদিন যেদিন সাত ফর্মার সাতটা ছাপা নাটক নিয়ে হন্তদন্তভাবে সে হাজির হ'ল। শুধু হাজির হওয়া নয় আবদার করে বলে বসলো—"স্যার, আমার নাটকের ভূমিকা লিখে দিতে হবে। আপনি লিখলে তবে বই বাঁধাতে যাবে।" নানান

অজুহাতে পিছিয়ে যেতে চাইলাম। কিন্তু ও এমন ভাবে দাঁড়িয়ে রইল, যাতে সেদিন ওকে ফেরাতে পারিনি। বললাম—দাও—তবে, ভাল লাগলে কিছু লিখবো—না হলে কিছুই লিখ্‌বো না। সত্যি কথা কি নাটকগুলো পড়ে ফেললাম। আনন্দ পেলাম। অবাকও হলাম। নাটকগুলো নিয়ে কিছু ভেবেও ফেললাম। ছেলেটা ছন্নছাড়া, কোথায় কখন যে কী করে তা বোঝাই যায় না। ওর এই ছন্নছাড়া জীবনের পেছনে যে এমন শক্তি আছে আগে তা জানতাম না বলেই প্রথমটা বেশ বিস্ময় লাগলো। শ্রীমান আমার ছাত্র। কাজেই ভূমিকা লেখার ব্যাপারে তার প্রতি পক্ষপাতিত্ব থাকাটাই স্বাভাবিক। কথাটা অস্বীকার করার মত নয়। নিঃসন্দেহে স্নেহের খাতিরে শ্রীমানের বিষয়ে দু'চারটে রঙ ফলানো কথা বলতে পারি। কিন্তু সেটাই বড় কথা নয়। আসল কথা নাট্য-সাহিত্যের এই বিরাট —বিশাল পটভূমিকায় বিশেষ করে সমাজ সংস্কারের প্রশ্ন যেখানে জড়িয়ে রয়েছে সে ক্ষেত্রে এই তরুণ নাট্যকারকে সাদর আহ্বান জানানো যায় কি না? বিনা সংকোচেই বলছি—হ্যাঁ, যায়। তবে ঐ নাটকগুলোর মধ্যে ভুলত্রুটি যে নেই. সে কথাও বলতে চাইছি না বা বলতে পারি না—অন্ততঃ বলার মত সাহস আমার নেই। সে সব বিজ্ঞ-গুণীজনেদের দীর্ঘ আলোচনা সাপেক্ষ বিষয়।

নাটক হচ্ছে-দৃশ্যকাব্য। আর সেই দৃশ্যকাব্য হচ্ছে গতিশীল সমাজ জীবনেরই বাস্তবায়িত মহাকাব্য। আজকের যুগ ছোটযুগ, অস্থিরতার যুগ। এ যুগে মানুষে মানুষে যোগসেতু রচনার প্রয়াসও অল্প কালের মধ্যেই সীমায়িত। কেন না, কাজ-কর্ম ব্যস্তময় জীবনযাত্রার তাগিদে মানুষের হাতে সময় অল্প। তাই মানুষ অল্প সময়ে বেশী পেতে চায়। উপভোগ করতে চায় নিটোল সমগ্রতাকে। এই অল্প সময়ে অনেক পাওয়ার প্রয়াসেই বোধহয় নাটকের পরিসর কমেছে। বহু শায়িত চলমান জীবন যাত্রার সার অংশটুকুকে রস-রূপ দেবার জন্যে গণতান্ত্রিক শিল্প হিসেবে এসেছে একাংক নাটক। একাংক নাটকের সবচেয়ে যেটা বড় জিনিস

তা হচ্ছে—অল্প পরিসরের মধ্যে সম্পূর্ণ শিল্প সম্মত রস পরিণতি। অগ্নিদূত সেদিক থেকে সিদ্ধহস্ত বলা চলে। শ্রীমানের সাতখানা নাটকই বিষয়বস্তু এবং রস-বৈচিত্র্যের দিক থেকে ভিন্নধর্মী। প্রত্যেকটা নাটকের মধ্যে মৌলিকত্ব যথাসম্ভব বজায় আছে। আজেবাজে বাড়তি কথা বা চরিত্র বড় একটা চোখে পড়লো না; বক্তব্য বিষয় নিটোল, সরল এবং স্বাভাবিক। সবচেয়ে যে জিনিসটা নাটক লেখার জন্যে দরকার—তা হচ্ছে সংলাপ সৃষ্টি করার ক্ষমতা। শ্রীমানের সংলাপ সৃষ্টি করার ক্ষমতা বেশ আছে। এই নাটকগুলোর সাহিত্য মূল্য ছাড়াও রয়েচে এর অভিনয় মূল্য। সাদাসিধে মঞ্চব্যবস্থা এবং স্ত্রী চরিত্র বর্জিত নাটক কয়েকটি থাকায় যে কোন সংস্থার পক্ষে অভিনয় করা সম্ভব হবে। অর্থাৎ সাধারণ সংস্থার পক্ষে নাটকগুলো বেশ উপযোগী হবে বলেই মনে হয়। একটু ভাল করে তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে নাট্যকার যে যে সমস্যাগুলোকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে তার একটা অস্পষ্ট সমাধানও রয়েছে।

শ্রীমান যুগ-সচেতন। এত অল্প বয়েসে সমাজচেতনা সম্পর্কে যে একটা প্রগতিশীল মনোভাব গড়ে উঠতে চলেছে এটা খুবই সুখের বিষয়। আরো অনুশীলন করলে আরো ভাল ফল নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। প্রথম আবির্ভাবেই শ্রীমানের কাছ থেকে আমরা সাতটা বিভিন্ন রস ও বিষয়ের নাটক পেলাম। এদিক থেকে বাংলা নাট্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে শ্রীমানের আগমনটি যে শুভ সূচনামূলক তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। শ্রীমানকে আমি আশীর্বাদ করি—সে যেন নাট্যসেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে ভবিষ্যতে দেশ ও দশের উপকার এবং শ্রীবৃদ্ধি করে।

অহীন্দ্র চৌধুরী।

১

॥ আলম্বন ॥

॥ আলম্বন ॥

॥ চরিত্র লিপি ॥

(১) বাবা

(২) খোকন

(৩) মাধুরী

মঞ্চ ও শিল্পী নির্দেশনা :—

সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের একটা ঘর। ঘরে দু'একটা আলমারী। তাতে বই থেকে শুরু করে কাঁচের কিছু বাসন পত্তর-ও আছে। একটা ইজিচেয়ার। ছোট একটা টেবিল। দু'টো চেয়ার দেয়ালের দিকে হেলান আছে। বাবা ইজিচেয়ারে বসে আছেন। বয়েসটা বার্ধক্যের কাছাকাছি। দর্শকদের সামনা সামনি একটা দরজা দেখা যাচ্ছে। তিন ফ্লাটের মঞ্চ। বাঁ-হাতের ফ্লাটে কোন জানালা নেই। ডান হাতের ফ্লাটে একটা দরজা আছে। এই দরজাটা বাইরে থেকে যাতায়াত করার জন্যে। সামনের দরজায় ঝুলন্ত পর্দা। ভেতরে ঘর আছে। তবে তা দেখা যাচ্ছে না। পর্দা টানলেই ভেতরের ঘরের একটা দেয়াল স্পষ্ট দেখা যাবে। দেয়ালে বড়দির একটা ফুল সাইজের ছবি। তাতে ফুলের মালা। ডান হাতের ফ্লাটে একটা জানলা রাখলেও রাখা যেতে পারে।

পর্দা দু'পাশে সরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চের আলো জলে উঠবে। বোঝা যাবে সকাল বেলা। বাবা আহতমনে বসে আছেন। চিন্তিত ভাব। অনেকটা মর্মাহত—তাই বিষণ্ন। কিছুক্ষণ পর বাইরে থেকে খোকন মিষ্টি হাতে মঞ্চে ঢুকলো। খোকন আঠার বছরের দোহারা চেহারার একজন যুবক। খোকনের হাতে মিষ্টিতে চোখ পড়তেই—

বাবা ॥ তোমার হাতে ওটা কি ?

খোকন ॥ মিষ্টি।

বাবা ॥ মিষ্টি কি হবে ?

খোকন ॥ সেই ভদ্র মহিলা আসবেন।

বাবা ॥ কোন্ ভদ্র মহিলা ?

খোকন ॥ সেই যে আপনাকে বলেছিলাম —

বাবা ॥ অঃ—সেই জন্যেই তুমি আমার কাছ থেকে পয়সা নিলে ? —তা কখন আসবে ?

খোকন ॥ সময় তো হয়ে গেছে। এইবারে হয়তো এসে পড়বেন।

বাবা ॥ অঃ—।

খোকন ॥ আমি তা হলে যাই ?

বাবা ॥ হুঁ ! [খোকন যেতে চায়] —হ্যাঁ, দাঁড়াও

খোকন ॥ কি বলছেন ?

বাবা ॥ বলছি, দাঁড়াও।

খোকন ॥ আজ্ঞে দাঁড়িয়ে তো আছি।

বাবা ॥ [কি যেন ভেবে] তোমার মাথায় কি আছে ?

খোকন ॥ কেন ?

বাবা ॥ যা জিজ্ঞাসা করছি তার উত্তর দাও।

খোকন ॥ আজ্ঞে মাথায় চুল—ভেতরে ঘিলু।

বাবা ॥ হতভাগা !

খোকন ॥ আপনি কি বলছেন বাবা !

বাবা ॥ বলছি তোমার মাথায় আরো কিছু আছে।

খোকন ॥ আজ্ঞে তা আছে। এই ব্যাণ্ডেজটা।

বাবা ॥ [রেগে যান] বলি, কিছু জান ?

খোকন ॥ কি জানি ?

বাবা ॥ তোমার মাথায় ব্যাণ্ডেজ কেন, তা জান ?

খোকন ॥ এ আপনি কি বলছেন। আমার মাথায় ব্যাণ্ডেজ কেন তা আমি জানি না !

বাবা ॥ না, তুমি জান না। [রাগে গজগজ করতে থাকেন] তুমি একটা পাগল।

খোকন ॥ আমি! মানে?

বাবা ॥ পাগল মানে Mad. Yon are a mad—no doubt.

খোকন ॥ না বাবা!

বাবা ॥ Yes—Yes—তুমি সত্যই পাগল। হাজার বার পাগল।

খোকন ৷ আমি ঠিক 'ম্যাটার'টা 'ক্যাচ্' করতে পারছি না।

বাবা ॥ 'ক্যাচ' করে দরকার নেই! কোথাকার কে তার ঠিক নেই—পথেঘাটে যে তোমায় অসম্ভব অপরাধী বলে মনে করে, যে তোমায অপমান করে—এমন কি যে লোকজন দিয়ে তোমার মাথা ভেঙ্গে দিতে কসুর করে না তার জন্যে তুমি মিষ্টি আনতে--

খোকন ॥ বাবা!

বাবা ॥ তোমার 'প্রেসটিজ' না থাকতে পারে--আমার একটা আত্ম-সম্মানবোধ আছে—পথের লোকেরা তোমার অপকীর্তিব জন্যে আমায় বাদ দিয়ে কথা বলে না!

খোকন ॥ আপনি কি বলতে চাইছেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

বাবা ॥ আমি বলতে চাইছি, যে তোমাকে পছন্দ করে না, তার কাছে কাঙালের মত ভালবাসা ভিক্ষা চাইতে যাওয়ার কোন যুক্তি নেই।

খোকন ॥ যুক্তি দিয়ে ভালবাসা বিচার করা যায় না। ওটা অন্তরের জিনিস।

বাবা ॥ জানি। তবুও—খোকন,—This is very bad habit. Give up this bad habit. এটাকে ত্যাগ করো। এই সবে ঐ মেয়েটার বিষয় নিয়ে তোমার নামে এপাড়ার একজন বিশিষ্ট লোক রিপোর্ট করে গেলেন। আমি তা নীচু মুখে সহ্য করেচি---আমি বড় আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি—

খোকন ॥ আপনি আমায় যাই বলুন না কেন—আমি সব মাথা পেতে সইব। তবে একটা কথা, আপনি আমায় আঘাত করবেন না।

বাবা ॥ আঘাত! হ্যাঁ আঘাতই আজ তোমার দরকার! এতদিন তোমার নিজের খুসী মত তুমি অনেক কাজ করেছ। কোন দিনের তরে আমি এতটুকু শাসন করিনি। তুমি নিজের খেয়াল-খুসী মত চলেছ। আমি সব ছেলেমানুষি বলে উড়িয়ে দিয়েছি। না খোকন—তুমি দিনের দিন কেমন যেন হয়ে যাচ্ছ।

খোকন ॥ আমি যাই করিনা কেন, আমি তো আপনার কাছে সত্য কখনো গোপন করি না।

বাবা ॥ তবুও কেন তোমার মত শিক্ষিত ছেলের নামে পাড়ার লোকেরা আমার কাছে 'রিপোর্ট' করে যায়? কেন তারা অকারণে তোমার অসভ্যতার জন্যে আমায় কথা শুনিয়ে যায়?

খোকন ॥ আমার অন্যায় হয়েছে বাবা। ক্ষমা করবেন! এবার চেষ্টা করবো, যাতে আপনাকে আমার নামে কেউ যেন নালিশ না করে—

[কথা শেষ না হতে হতেই বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হয়।]

বাবা ॥ খোকন, দেখতো—কে কড়া নাড়ে।

খোকন ॥ দেখছি বাবা।

[খোকন বাইরের দরজা খুলে দেয়। পরে মাধুরীকে নিয়ে ঘরে ঢোকে। বাবা উঠে দাঁড়ান। অবাক হয়ে খানিকক্ষণ মাধুরীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।]

খোকন ॥ বাবা, আপনাকে বলেছিলাম, উনি ঠিক আসবেন। [খোকন পরিচয় করিয়ে দেয়।] ইনি আমার বাবা। আর বাবা, ইনি হচ্ছেন মাধুরী দেবী—আপনাকে যার

কথা বলেছিলাম। [মাধুরী হাত তুলে নমস্কার জানায়।] ইনি ৩৫ নম্বর বাড়ীতে এক মাস হ'ল ভাড়া এসেছেন। চমৎকার রবীন্দ্র সংগীত গাইতে পারেন—বড়দির চেয়েও ভাল।

বাবা ॥ বসো মা বসো।

মাধুরী ॥ না না, ঠিক আছে ; আপনি বসুন।

খোকন ॥ [খুসী মনে] দাঁড়ান, আপনার জন্য চেয়ার এনে দিই। [খোকন দেয়ালের কাছ থেকে একটা চেয়ার আর ছোট চায়ের টেবিলটা এনে সাজিয়ে দেয়।] আপনি এই চেয়ারে বসুন।

মাধুরী ॥ [রাগত কণ্ঠে] থাক্—আমি এক্ষুনি চলে যাবো।

বাবা ॥ সেকি মা! এইতো এলে, বসো।

মাধুরী ॥ আমায় ইউনিভার্সিটিতে যেতে হবে।

খোকন ॥ ওসব চলবে না। আমাদের বাড়ী যে কালে এসেছেন, তখন আপনাকে আমরা যা খুসী তাই করতে পারি—নিন এখানে বসুন। [মাধুরী আরো রেগে যায়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বসে।]

খোকন ॥ এই তো বেশ হয়েছে। আপনি বসুন, আমি আপনার জন্য চা নিয়ে আসি।

মাধুরী ॥ ব্যস্ত হবার কোন দরকার নেই। আমি চা খাই না।

খোকন ॥ ভালই হ'ল। আর ঝামেলা পোয়াতে হবে না। চা না খেলেও মিষ্টি তো খাবেন। [কথাটা তাড়াতাড়ি শেষ করে খোকন ভেতরের ঘরে চলে গেল।]

বাবা ॥ তোমরা কত নম্বর বাড়ীতে এসেছ ?

মাধুরী ॥ ৩৫ নম্বর।

বাবা ॥ ওঃ—ঐ হলদে রঙে'র তিন তলা বাড়ীটায়।

মাধুরী ॥ হ্যাঁ।

বাবা ॥ আমি তোমার কথা অনেক বার শুনেছি মা—

মাধুরী ॥ দেখুন, আপনার সঙ্গে গুটিকয়েক কথা আছে।

বাবা ॥ বেশ তো, বিনা সংকোচেই বল।

মাধুরী ॥ আচ্ছা, আপনি আমায় কি চোখে দেখেন ?

বাবা ॥ কেন, নিজের মেয়ের মতন।

মাধুরী ॥ ভরসা পেলাম—আমি কিন্তু আপনার কাছে কতকগুলো অভিযোগ আনবো। অপরাধ নেবেন না কিন্তু।

বাবা ॥ সেকি কথা! তুমি বল। আর অভিযোগ শোনবার পর যদি কোন কর্তব্য থাকে, তা আমি পালন করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।

মাধুরী ॥ অভিযোগ হচ্ছে আপনার ছেলের বিরুদ্ধে।

বাবা ॥ [গম্ভীর হয়ে] বেশ, বল।

মাধুরী ॥ দেখুন আমি য়ুনিভার্সিটিতে সিক্‌স্থ ইয়ারে পড়ি। আমার বয়েস অনেক। এপাড়ায় মাস খানেক হ'ল এসেছি। কিন্তু আপনার ছেলের দুর্ব্যবহারের জন্যে এপাড়া আমাদের ছেড়ে দিতে হবে।

বাবা ॥ [নীরব]

মাধুরী ॥ যেচে-যেচে আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। আমার পিছু পিছু আসে। বন্ধুদের সঙ্গে থেকে কেমন সব কু-ইঙ্গিত করে। একদিন কলেজ ষ্ট্রীট পর্যন্ত পেছন পেছন গেছে। সেদিন রাস্তায় বেমালুম বলে বসলো—আপনি যতদিন এ পাড়ায় থাকবেন, ততদিন এমনি ভাবে আপনাকে জ্বালাবো।

বাবা ॥ হু! সেই জন্যেই --

মাধুরী ॥ দেখুন, রাস্তার লোকেরা কে কি করছে তা আমি জানি না।

বাবা ॥ সত্যি তো, তা তুমি জানবে কেন।

মাধুরী ॥ যাইহোক, আপনি জেনে রাখুন, আমি অত্যন্ত ভদ্রঘরের মেয়ে—মা-বাবা আছেন—কিন্তু এভাবে সহজ

স্বাভাবিক ভাবে পথচলতে যদি অপ্রস্তুতে পড়তে হয়, তবে —তবে—তাছাড়া এই রকম নোংরামী আমি মোটেই—

[খোকন ডিসে মিষ্টি সাজিয়ে ভেতরের ঘর থেকে এলো।]

খোকন ॥ এই নিন, মিষ্টি খান।

বাবা ॥ খোকন, তুমি একটু ভেতরের ঘরে যাও তো।

খোকন ॥ সবগুলো খাবেন কিন্তু [খোকন ভেতরের ঘরে চলে যায়।]

বাবা ॥ একটা কথা কি জান মা, সত্যি যদি ও তোমায় এই ভাবে অপদস্ত করে —

মাধুরী ॥ আমি কি আপনাকে মিথ্যা বানিয়ে বলছি ?

বাবা ॥ না না, মা—আমি তা বলছি না। তুমি যা বলছ সবই সত্য। আমি বলছি খোকনের এই দুর্ব্যবহারের জন্য আমি অত্যন্ত লজ্জিত। আমি এর জন্য ওর হয়ে তোমার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি মা। তুমি বুড়ো বাপ মনে করে—

মাধুরী ॥ সেকি কথা। আমি শুধু নিজের প্রটেক্শনের জন্য—

বাবা ॥ একটা কথা কি জান মা, সত্যি কথা কি তোমাদের আমরা কিছুই বলতে পারি না। যুগের চাকা অন্যভাবে ঘুরছে। তুমি আমার কথায় রাগ করো না মা। আমি যুগের কথা বলছি। সমাজের ফাঁকির দিকটা তুলে ধরচি। বুড়ো বাপের মত হয়ে কতকগুলো কথা বলছি মা— তুমি রাগ করো না—তোমরা হচ্ছ এই—এই অস্থিরতার যুগের মেয়ে, রুচী-অরুচীর পার্থক্য তোমরা ঠিকই বুঝতে পারো। কিন্তু মাঝে মাঝে হৃদয়ের আসল দিকটা ঠিক ধরতে পার না। হৃদয়ের দাঁড়িপাল্লায় হৃদয়কে ঠিক মাপতে পার না। একটু ভুল করে ফেল—অবশ্য এতে তোমাদের দোষ দেয়া যায় না—সমাজ যেদিকে নিয়ে যায় তোমরাও সেই দিকে যাও। আমার মনে হয়, খোকনের সম্বন্ধে তুমি যে 'এ্যাটিচ্যুট্' নিয়ে

অভিযোগ করছো—আমার মনে হয় সেটা একটু—মানে একটু—যাকৃগে। আমি তোমায় কথা দিচ্ছি মা—তোমার প্রতি এই অন্যায় আচরণের জন্যে আমি ওকে কঠোর শাস্তি দেব।

মাধুরী ॥ না, না—আপনি বরং ওকে একটু বুঝিয়ে বলবেন, তা হলেই হবে।

বাবা ॥ সত্যি কথা কি জান মা, ওর মাথাটা আমিই খেয়েছি। [একটু দম নেন] আমার ছেলের সম্বন্ধে দু'একটা কথা তোমায় বললে ভাল হ'ত, তবে তোমার হাতে সময় বড় অল্প তাই ভরসা—

মাধুরী ॥ আপনি বলুন। আমার হাতে এখনো কিছু সময় আছে। অবশ্য আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে।

বাবা ॥ আমার আপত্তি কেন থাকবে মা। ব্যাপারটা কি জান—খোকনের জীবনে প্রচুর জমাট বাঁধা বেদনা আছে। বাপ হয়ে ওর অসুবিধে গুলো শুধু আমি অনুভব করি—আর কিছুই করতে পারি না।

মাধুরী ॥ [নম্র হয়]

বাবা ॥ ছ'বছর আগে খোকনের মা মারা যায়। খোকন আমার একমাত্র ছেলে। আর মেয়ের মধ্যে ওর বড়দি। বড়দির ভাগ্যটাও তেমনি। তা না হলে বিয়ের বছর কাটতে না কাটতে জামাইটা ছুটি নেবে কেন।

মাধুরী ॥ আপনার জামাইয়ের কি হয়েছিল?

বাবা ॥ 'করোনারী থম্‌বসিস'—মস্ত বড় ডাক্তার। বড় মেয়ে বিধবা হবার পর ওকে আমি নিজের বাড়ীতে এনে রাখি। খোকনের সব দায়িত্ব বড় মেয়ে নিজের হাতে নিয়েছিল। মা-মরা ছেলের বড়দিই একমাত্র স্বপ্ন, একমাত্র সম্বল। প্রায় ছ'বছর আমি খোকনের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ছিলাম মা। আমার ভাগ্যের কথা আর

কি বলবো মা। আজ প্রায় চার মাস হ'ল ওর বড়দি মারা গেছে! [চোখ ছল ছল করে ওঠে] রোজই খোকন তোমার কথা বলে। বলে,—বাবা এ পাড়ায় একটা মেয়ে এসেছে ঠিক বড়দির মত দেখতে! ও আমার কাছে কোন দিন কোন কথা লুকোয় না। আজ দেখছি খোকন কিছুমাত্র ভুল করেনি। তোমার সঙ্গে ওর বড়দির কোন জায়গায় এতটুকু অমিল নেই। হয়তো বাঁদরটা তোমার মাঝেই ওর বড়দিকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল।—যাইহোক মা, হতভাগার ওপর কোন অপরাধ না নিয়ে নিজের ভাইয়ের মত ভেবে ওকে ক্ষমা করো। আমি কথা দিচ্ছি, ও তোমায় আর কোন দিন রাস্তায় বিরক্ত করবে না।

[মাধুরী লজ্জায় সংকুচিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।]

কি হ'ল মা—উঠে পড়লে যে?

[মাধুরী বাবার পায়ে প্রণাম করে।]

মাধুরী ॥ আপনি আমায় ক্ষমা করুন মেশোমশাই।

বাবা ॥ সেকি! অপরাধ করলো খোকন, আর তার জন্যে ক্ষমা চাইচো তুমি?

মাধুরী ॥ না মেশোমশাই, অপরাধ আমারই।

বাবা ॥ দূর বোকা মেয়ে!

মাধুরী ॥ এরপর অন্য কথা বললে বুঝবো—আপনি আমায় মোটেই নিজের মেয়ের মত মনে করেন না।

বাবা ॥ তা তো হ'ল, কিন্তু এই খাবারগুলো খাবে কে? তুমি আসবে বলে খোকন নিজের হাতে কিনে এনেছে। নিজের হাতে সাজিয়ে গিয়েছে।

মাধুরী ॥ এই সব মিষ্টি আমরা তু'জন খাবো। খোকন কোথায়?

বাবা ॥ বোধহয় ও ঘরে।

[মাধুরী তাড়াতাড়ি ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। হাত দিয়ে পর্দা সরাতেই দেখতে পেল খোকন ফুল দিয়ে সাজানো বড়দির ছবি নীচে দাঁড়িয়ে কাঁদছে]

মাধুরী ॥ খোকন।

খোকন ॥ [নীরব]

মাধুরী ॥ খোকন।

খোকন ॥ কে !

মাধুরী ॥ আমি তোমার বড়দি।

খোকন ॥ [মুখ ফিরে] মিথ্যে কথা! আমার বড়দি মরে গেছে—ঐ তার ছবি।

মাধুরী ॥ ছি ! ও কথা বলে না।

খোকন ॥ রাস্তায় আপনার সঙ্গে হেসে কথা বলতে যাই বলে আপনি বাবার কাছে নালিশ করতে এসেছেন? আমি সব শুনেছি। আপনি আমার কেউ নন। পর কখনো আপন হয় না। বড়দি তিন মাস আগে মারা গেছেন।

মাধুরী ॥ না খোকন, আমিই তোমার বড়দি।

খোকন ॥ মিথ্যে কথা।

মাধুরী ॥ তোমার বড়দি কখনো মিথ্যে কথা বলেছে?

খোকন ॥ [আশার আলো দেখতে পায়।] তুমি ঠিক বলছো! তুমি আমার বড়দি হবে? ঠিক বলছো!

মাধুরী ॥ হ্যাঁ ঠিক।

খোকন ॥ তুমি আমার গা ছুঁয়ে বল।

মাধুরী ॥ [কাছে গিয়ে আরো কাছে টেনে] হ্যাঁরে বোকা হ্যাঁ।

খোকন ॥ তুমি আমায় আর ছোট ভাববে না?

মাধুরী ॥ না।

খোকন ॥ ঠিক বলছো ?

মাধুরী ॥ আবার কতবার বলবো।—চল এবার মিষ্টিগুলো শেষ করি।

খোকন ॥ তুমি মিষ্টি খাওনি ?

মাধুরী ॥ তুমি না খেলে আমি কি করে খাবো !

[মাধুরী খোকনের হাত ধরে ছোট্ট টেবিলের কাছে এসে মিষ্টি তুলে খোকনের মুখে দেয়। খোকনও মিষ্টি তুলে মাধুরীর মুখে দেয়।]

খোকন ॥ নাও—এবার একটা বিরাট হাঁ করো।

[খোকন মিষ্টি মুখে দেয়। এভাবে দু'জনে আনন্দে উচ্ছল হয়ে মিষ্টি খেতে থাকে। এই দৃশ্য দেখে বাবার সিক্ত মুখ খুশীতে ভরে উঠে। মঞ্চ আস্তে আস্তে অন্ধকার হয়ে এলো। প্রেক্ষাগৃহের আলো জ্বললে দেখা গেল মঞ্চের পর্দা পড়ে গেছে]

২

॥ ত্রিভুজ ॥

॥ ত্রিভুজ ॥

চরিত্র

(ক) সুবেশ

(খ) অতনু

দোতলার ওপরে একখানা ঘর। ছিমছাম পরিবেশ। দেখলেই মনে হয় —ঘরটা একজনের থাকার মত। একটা সিংগেল বেড্। একটা করে চেয়ার-টেবিল। একটা আলমারী। তাতে দিশি-বিদেশী অনেক বই। ঘরের দুপাশে দেয়াল। মাঝে দরজা। দু'একটা ছবি টাঙানো আছে। দরজা বাইরের দিক থেকে বন্ধ। দরজা খুললেই উপরে ওঠার সিঁড়ি দেখা যাবে। সুবেশ এখনো আসেনি, মঞ্চে আবছা আলো।······সুবেশ অস্থির হয়ে প্রবেশ করে। মেঝেতে নোংরা দেখে ক্ষেপে লাল হয়ে ওঠে।—

সুবেশ ॥ নাহু—নাহু—নাহু! যাচ্ছে তাই!! নাহু। [মনে পড়ে যায় নাহু বাড়ীতে নেই।] ওঃ—তাও তো বটে, ওকে যে আজ সকালে ছুটি দিলাম। কিন্তু ব্যাটা ঘরটাও পরিষ্কার করে যায়নি! ওকে এবারে তাড়াবো। [রেগে লাল হয়ে উঠে। চেয়ারে বসে জুতো-মোজা খুলতে থাকে। জুতো খুলতে গিয়ে বুটের ফিতেতে গিঁট লেগে যায়। সুবেশ তাতে আরো রেগে যায়। কোন রকমে জুতো পা থেকে টেনে বের করে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। মোজা আর খোলে না।] আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি—আমি বড্ড বদ মেজাজী হয়ে পড়েছি। কোন কাজে মন বসাতে পারছি না। না অফিসে—না পড়ায়। [চেয়ার ছেড়ে খাটে এসে বসে।]

আমি বরং পালাই! অনেক দূরে চলে যাই। [কিছুক্ষণ আপন মনে আকাশ-পাতাল ভাবতে থাকে।] হুঁ! না! মরবো না। কেন মরবো? এক জনের জন্যে মরবো? মরা তো কাপুরুষের কাজ। জীবনকে ফাঁকি দেব কি জন্যে? কার জন্যে? [কিছুক্ষণ থামে] আচ্ছা, এখন যদি অতনু এসে পড়ে!—অ'সুক না, আমি কি করবো। আমার কি করবার আছে—কী-ই বা করার থাকতে পারে! —আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, এত ভাবনা কোথা থেকে আসে? [উঠে দাঁড়ায়] নাঃ! নিজেকে কিছুতেই এ্যাড্‌জাষ্ট করতে পারছি না। জগতে কত বড় বড় প্রেমের লড়াই হয়েছে। তাতে কেউ হেরেছে—কেউ জিতেছে। তাতে একজন ত্যাগ করে, একজন লাভ করে। অতনু আমার পরম বন্ধু—অতনু আমার জন্যে—কিংবা আমি অতনুর জন্যে—না, কিছুতেই না! আমার এই টালবেসামাল অবস্থায় অতনুর জীবনে আমি অভিশাপ আনবো না—কিছুতেই না। [খাটে হেলান দিয়ে বসে।] আমি আনতে পারি না। ও আমার বন্ধু—অতনু তুই বিশ্বাস কর ভাই—আমি—আমি কিছুতেই তা হতে দেব না [সুরেশের চোখে নিদ্রা আসে। সুরেশ নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ে। অতনু বাইরে থেকে সুরেশের নাম ধরে দু'-একবার ডাকলো। সাড়া না পেয়ে অতনু ঘরে ঢুকে পড়ে। অতনু সুরেশের অবস্থা দেখে হতবাক্ হয়ে পড়ে। দু'-একবার ডাকে। গায়ে হাত দেয়। তাতেও সাড়া পায় না। গায়ে জোরে ধাক্কা দেয়।]।

অতনু ॥ সুরেশ। এই সুরেশ। এত সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়েছিস্ যে। ওঠ্।

সুরেশ ॥ [ঘুম ভেঙে যায়। অবাক হয়ে তাকিয়ে] আরে—তুই! তোর কথাই ভাবতে ভাবতে এতক্ষণ—

অতনু ॥ আমিও তাই ভাবছিলাম—কি ব্যাপার, এত সকাল সকাল—এখনো ন'টা বাজেনি—হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়লি যে ? তার ওপর ঘুমটাও বলিহারি ! কতবার ডাকলাম, অবশেষে সজোরে ধাক্কাপূর্বক কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভঙ্গ !

সুবেশ ॥ তুই এত রাতে যে ?

অতনু ॥ [ঠাট্টা করে] নিদ্রাদেবী কি এখনো প্রস্থান করেননি ? এত রাত ! এত রাত আবার কোথা ? এখনো ন'টা বাজেনি । চাকরটা কোথা ?

সুবেশ ॥ সকালে বাড়ী যাব বলে ধরেছিল--ছুটি দিয়েছি ।

অতনু ॥ বেশ করেছিস্ । ঘুমোবিতো ঘুমো—তা একেবারে দরজা খুলে । তারপর ঘুম ভাঙ্গার পর যখন দেখবি ঘরে তুই ছাড়া আর কোন সম্বল নেই, তখন কি হবে !

সুবেশ ॥ শরীরটা ভাল নয় । বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছি । তা' ছাড়া তুই যে এখন হঠাৎ আসবি, সেটা আগে থেকে জানাবি তো ?

অতনু ॥ বাঃ !

সুবেশ ॥ মানে ?

অতনু ॥ মানে বাঃ ! অফিসে তোকে কি বলেছিলাম ?

সুবেশ ॥ [মনে পড়ে যায়] ওঃ—তাও তো বটে ! হ্যাঁ—তুই বলেছিলি বটে । কিন্তু সত্যি বলছি, আমার শরীরটা বড্ড খারাপ ।

অতনু ॥ বলিস্ কিরে ! শরীর খারাপ হলে কালকে এত কাজ তাহ'লে করবে কে ? কই দেখি · [গায়ে হাত দিয়ে দেখে] —গা তো দিব্বি ঠাণ্ডা । পাশ কাটানোর চেষ্টা করছিস্ ?

সুবেশ ॥ [দমে যায়] কি যে বলিস, তার ঠিক নেই ।

অতনু ॥ তা নয় তো কি । তোকে বললাম 'জি-পি-ও'-র সামনে অপেক্ষা করবি—আমার আসতে হয়তো একটু দেরী হবে—

সুবেশ ॥ তাই [illegible]

অতনু ॥ [অবাক হয়] এই দেখো! তুই কী রে? এত ভুলে যাস কেন? [কাছে এসে] এই, সত্যি করে বলতো, তোর কি হয়েছে?

সুবেশ ॥ বাজে বকিস না।

অতনু ॥ না, না, লুকোসনি। বল, কেন তুই এমন মন-মরা হয়ে আছিস। এইরকম একটা অনুষ্ঠানে কোথায় তোরা সবাই আনন্দ করবি—সহযোগিতা করবি, তা নয়—

সুবেশ ॥ অনুষ্ঠান! অনুষ্ঠান তো আমার কি?

অতনু ॥ [দমে যায়] ওঃ! নিশ্চয়ই! অনুষ্ঠান যে আমার, তাতে তোর কি। বটেইতো! আচ্ছা, তবে তুই আমায় এত উৎসাহ দিলি কেন?

সুবেশ ॥ আমার ইচ্ছে।

অতনু ॥ তোর ইচ্ছে! এতখানি এগিয়ে শেষটুকু তুই যে এভাবে ভেঙ্গে দিবি, তা আমি ভাবতেও পারছি না।

সুবেশ ॥ জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটে যায়, যা সত্যি ভাবা যায় না—অথচ তা ঘটে।

অতনু ॥ রাখ তোর দার্শনিকতা। [পকেট থেকে কার্ড বের করে দেয়।] এই নে কার্ড, সকাল সকাল যাবি—যদি না যাস তবে বুঝবো—তুই আমার অমঙ্গল কামনা করিস। [সুবেশ বাধা দেয়।]

সুবেশ ॥ না, না অতনু, আমি তোর অমঙ্গল কামনা করিনা, করতে পারি না।

অতনু ॥ এই নে কার্ড।

সুবেশ ॥ [কার্ড নিয়ে] কার্ড! কার্ড কেন?

অতনু ॥ এত কিছু করার পর সীলা কার বাবা! না, আরো কিছু খরচ করতে হ'ল।

সুবেশ ॥ কেন, কার জন্যে?

অতনু ॥ তোর জন্যে।

সুবেশ ॥ কেন ?

অতনু ॥ একটা টিকিট কাটতে হবে।

সুবেশ ॥ টিকিট !

অতনু ॥ হ্যাঁ টিকিট, শ্রীমান সুবেশ চন্দ্রের জন্যে। রাঁচী এক্সপ্রেসের। তোর মাথাটা নির্ঘাত গেছে !

সুবেশ ॥ আমার ?

অতনু ॥ তবে কার, আমার ?

সুবেশ ॥ কথ্খনো না।

অতনু ॥ তবে তুই হেঁয়ালী করছিস।

সুবেশ ॥ মিথ্যে কথা।

অতনু ॥ আমার সঙ্গে সুমিত্রার বিয়ে, তুই তা জানিস না ?

সুবেশ ॥ হ্যাঁ, জানি। গত সোমবার রেজিষ্ট্রেশনে অফিসে গিয়ে সাক্ষী দিয়ে এলাম—এর মধ্যেই তা ভুলে যাবো ? কাল তোদের অনুষ্ঠান, তাই আজ তুই আমায় নেমন্তন্ন করতে এসেছিস।

অতনু ॥ নেমন্তন্ন তোকে কেন করবো ? তুই না হলে আমার অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হবে না। বয়সে তুই আমার চেয়ে দু'বছরের বড়। তাই শুভেচ্ছার বদলে তোর কাছে আশীর্বাদই আশা করবো।

সুবেশ ॥ আমার আশীর্বাদে তোর কি হবে? আমি ছাড়া তোর আরো অনেক মানুষ আছে।

অতনু ॥ তুই আমায় পর ভাবছিস্ !

সুবেশ ॥ না-রে অতনু, তোকে আমি কখনো পর ভাবি না। মানে আমি তোকে ঠিক বোঝাতে পারছি না যে আমার ভেতরটা কি হচ্ছে !

অতনু ॥ সুবেশ, একটা কথা।

সুবেশ ॥ কি ? বল।

অতনু ॥ তুই খুব দুঃখ পেয়েছিস, না ?

সুবেশ ॥ না, না—দুঃখ পাব কেন? দুঃখ কিসের? কার জন্যে দুঃখ? সুমিত্রা তোর হবে—তুই ওকে বিয়ে করে সুখী হবি—এতে আমার কত উৎসাহ—কত আনন্দ!

অতনু ॥ আগের মত উৎসাহ কিন্তু তোর নেই।

সুবেশ ॥ না, না,—একি বলছিস!—তবে আমি জানি—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না—মাঝে মাঝে আমি কেমন যেন 'এ্যাব্নরম্যাল' হয়ে পড়ছি।

অতনু ॥ এর কারণটা কি?

সুবেশ ॥ কারণটা কি—তা আমি কি করে বলবো? কারণ জানলেতো সব ঘটনা পরিষ্কার হয়ে যেত।

অতনু ॥ আমার মনে হচ্ছে তুই যেন কিছু চেপে যাচ্ছিস।

সুবেশ ॥ চেপে যাচ্ছি! কেন, চাপার কি আছে? চাপবো কেন? [ভয় পেয়ে কাছে এসে] হ্যাঁরে, তুই সুমিত্রার বাড়ী গিয়েছিলি?

অতনু ॥ মাথা খারাপ! কাল অনুষ্ঠান, আর আজ ওর বাড়ীতে যাবো? লোকে কি বলবে?

সুবেশ ॥ সত্যিই তো,—লোকে কি বলবে! জানিস, তুই গেলে হয়তো সব জানতে পারতিস্!

অতনু ॥ কি জানতে পারতাম?

সুবেশ ॥ না—কিছু নয়!—মানে আমার বিষয়—

অতনু ॥ আমার বিষয়?

সুবেশ ॥ না—মানে তোর বিষয়—মানে সুমিত্রার বিষয়।

অতনু ॥ আমি তোর কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।

সুবেশ ॥ সব বুঝবি—আগে কপাটটা বন্ধ করে দে।

অতনু ॥ কেন, কপাট বন্ধ করবো কেন?

সুবেশ ॥ কেউ যদি শুনতে পায়।

অতনু ॥ কি এমন কথা, যা শুনলে—

সুবেশ ॥ যা শুনলে ভীষণ—মানে মারাত্মক এক ঘটনা ঘটে

যাবে। তুই দাঁড়া, আমি কপাটটা বন্ধ করে দিই। [সুবেশ কপাট বন্ধ করে।] আমি তোকে সব বলছি —তোকে সব বলে আমি আত্মহত্যা করবো ঠিক করেছিলাম—

অতনু ॥ কি পাগলের মত বকছিস !

সুবেশ ॥ পাগল ! আমার মত অবস্থায় পড়লে তুইও পাগল হোতিস।

অতনু ॥ তোর কথা শুনে আমার কোন লাভ নেই। কার্ড রইল—ইচ্ছে হয় যাবি, তা না হলে যাসনি।

সুবেশ ॥ অতনু, তুই আমার বন্ধু। দু'জনে একসঙ্গে সব সময় থেকে এসেছি—বিপদে আপদে একসঙ্গে এগিয়েছি—বড় হয়েছি। আচ্ছা, তুই আমায় সত্যি বন্ধু বলে স্বীকার করিস ?

অতনু ॥ কেন, সন্দেহ হয় ?

সুবেশ ॥ তুই আমার গা ছুঁয়ে বল—বল, আমায় বন্ধু বলে স্বীকার করিস ?

অতনু ॥ [বিরক্ত হয়ে] কি মুশকিল !

সুবেশ ॥ আচ্ছা, আমি যদি তোকে কোন আদেশ করি, তা তুই মানবি ?

অতনু ॥ মানার মত হলে নিশ্চয়ই মানবো।

সুবেশ ॥ এই সময় যদি তোকে খুব মর্মান্তিক একটা আদেশ করি, তা তুই মেনে নিতে পারবি ?

অতনু ॥ নিশ্চই পারবো। তবে তাতে যদি তোর কোন উপকার হয়।

সুবেশ ॥ তুই সুমিত্রাকে বিয়ে করিস না।

অতনু ॥ [চমকে উঠে] একি বলছিস !

সুবেশ ॥ তুই আমায় কথা দিয়েছিস—বল, সুমিত্রাকে বিয়ে করবি না।

অতনু ॥ বিয়েতো আমাদের হয়ে গেছে।

সুবেশ ॥ ও তো কাগজে-কলমে। এখনো অনুষ্ঠান বাকী—অগ্নিসাক্ষী বাকী।

অতনু ॥ বিয়েটা কাগজ নিয়ে খেলা নয় যে যখন-তখন তাকে ছিঁড়ে ফেলা যায়।

সুবেশ ॥ না অতনু, তুই রাগ করিস না—মানে আমি বলতে চাইচি—ধর, এমন ঘটনা ঘটলো যাতে করে তোর বিয়ে হ'ল না।

অতনু ॥ এমন অলৌকিক চিন্তার কোন মানে হয় না।

সুবেশ ॥ না, মানে ধর—সুমিত্রা যদি মারা গিয়ে থাকে—।

অতনু ॥ সুবেশ! বাড়াবাড়ির একটা সীমা আছে।

সুবেশ ॥ আমি জানি তুই একথা বলবি।—তুই জানিস্ না সুমিত্রার সঙ্গে আমার—

অতনু ॥ জানি। সুমিত্রার সঙ্গে তোর অনেক দিনের পরিচয়। প্রথমে তোরা বিয়ে করতে চেয়েছিলি। পরে সুমিত্রা তোকে 'রিফিউজ' করছে—।

সুবেশ ॥ অতনু, তুই কেন বুঝছিস না—

অতনু ॥ [আরো রেগে যায়] কি বুঝছি না? বল, তুই আমায় বোঝাতে পারছিস না। পাগলের মত সব আবোল-তাবোল বক্‌ছিস।

সুবেশ ॥ আবোল-তাবোল বকছি! তুই সত্যি বলছিস্? দাঁড়া এবারে তোকে সব খুলে বলছি। এই, একটু জল খাবি?

অতনু ॥ তুই খা।

সুবেশ ॥ আচ্ছা। [সুবেশ কুঁজো থেকে জল খায়।] হ্যাঁ—কি যেন বলছিলাম, বলছিলাম সুমিত্রা যদি মৃতা হয় তবে—তবে তুই—মানে তোর বিবাহ অনুষ্ঠান—

অতনু ॥ তোকে এবারে—

সুবেশ ॥ না, মানে—যদি সুমিত্রা মারা গিয়ে থাকে—

অতনু ॥ পাগলামোর সীমারেখা ক্রমে ছাড়িয়ে যাচ্ছে—।

সুবেশ ॥ না—তুই ধর না কেন—যদি—

অতনু ॥ [রাগত স্বরে] যাক্ গে—আমি চললুম—

[অতনু চলে যায়। সুবেশ তাকে বাধা দিতে পারে না।]

সুবেশ ॥ অতনু, যাস নি। আমি ঠিক খুন করবো ভেবে খুন করিনি —উত্তেজনা বশে গলাটিপে ধরলাম, তারপর—তারপর সব শেষ— সব অন্ধকার। কে? কে ওখানে! পুলিশ! না না, কেউ নয়। ঝড়ো হাওয়া! —অতনু আমার কথা না শুনে চলে গেল, আমি এখন কি করি! [মর্মাহত হয়ে খাটে আশ্রয় নিল।] হ্যাঁ—বিষ, বিষ খেয়েই—[পকেট হাতড়াতে থাকে।] কেউ বোধহয় সরিয়ে দিয়েছে। আমার হাতটা যে ঠাণ্ডা হয়ে আসছে! আমার কেমন ভয় হচ্ছে! হাত-পা কাঁপছে!—অতনু—অতনু— [চিৎকারে ঘর ফেটে পড়ে। সহসা অতনু দরজা ঠেলে ঘরে প্রবেশ করে। বেশ প্রফুল্ল ভাব। সুবেশের চিৎকার শুনে অতনু অবাক হয়ে যায়।]

অতনু ॥ কিরে—এত চেঁচাচ্ছিস্ কেন? [সুবেশ বিস্ফারিত দৃষ্টিতে অতনুর দিকে চেয়ে থাকে।] বাইরে কী ঝড়—ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি শুরু হয়েছে। তুই কখন এলি?

সুবেশ ॥ তুই আবার এলি?

অতনু ॥ তুই কি স্বপ্ন দেখছিস নাকি!

সুবেশ ॥ [হাত দিয়ে নিজের চোখ ঘসে] বোধ হয় তাই হবে।

অতনু ॥ বোধ হয় নয়, ঠিক। তুই এমন ভাব দেখাচ্ছিস যেন আমি একটু আগেই এসেছিলাম।

সুবেশ ॥ তা হলে তুই সত্যি আসিস নি? তবে যে তোর [চিঠিটা পড়ে] যা বাববা! এ যে মায়ের চিঠি। হা ভগবান!

অতনু ॥ [একটু চিন্তিত হয়ে সমবেদনার সুরে] ও রকম একটু-আধটু হয়। জানে দেও বাবা! নে উঠে পড়।

সুবেশ ॥ কোথায়?

অতনু ॥ আমার বাড়ীতে! তুই বললি যে আমি আসবো—এলিনা

বলেই তো আবার আসতে হলো। ওদিকে আবার ঝড়-জল শুরু হচ্ছে।

সুবেশ ॥ এত রাতে!

অতনু ॥ আরে সবে মাত্র সাড়ে ন'টা রাত কৈ! তুই না গেলে এত সব ম্যানেজ করবে কে? মা তোকে ধরে নিয়ে আসতে হুকুম করেছেন।

সুবেশ ॥ অসম্ভব!

অতনু ॥ মেজাজ গরম আমার কাছে করবি না। মা বলেছেন, যা বলার মাকে বলবি।

সুবেশ ॥ এই ঝড়-জলে কোথায়।

অতনু ॥ [জান্‌লা দিয়ে বাইরের দিকে তাকায়।] না-রে মেঘ কেটে যাচ্ছে। আর জল-ঝড় বোধ হয় হবে না।

সুবেশ ॥ আচ্ছা তুই যা, আমি পরে যাচ্ছি।

অতনু ॥ তোকে বিশ্বাস নেই। ওসব চলবে না। মা বলে দিয়েছেন —সত্যনারায়ণ পূজোর আশীর্বাদী ফুল নিতে হবে।

সুবেশ ॥ ফুল নিয়ে আমি কি করবো?

অতনু ॥ কি আবার করবি—আশীর্বাদ করবি—ভগবানের কাছে আমাদের দীর্ঘ জীবন কামনা করবি।

সুবেশ ॥ [আশান্বিত হয়।] দীর্ঘ জীবন!

অতনু ॥ তোর আশীর্বাদ ছাড়া কোন কাজ হবে না।

সুবেশ ॥ তাই নাকি?

অতনু ॥ বা-রে!

সুবেশ ॥ নিশ্চয়ই যাবো! তোদের দীর্ঘ জীবন কামনা করবো—তোরা নতুন জীবন শুরু করবি, নিশ্চয়ই যাবো! যাবো বৈকি! চল্।

[সুবেশের মুখে বেদনার মরমী আবেশ সরে গিয়ে উজ্জ্বল হাসি ফুটে উঠলো। অতনু ও সুবেশ গোছগাছ করে বেরিয়ে প'ড়ল। সেই ফাঁকে পর্দাও দু'পাশ থেকে মিশে এক হয়ে গেল।]

৩

॥ শেষ তিমিরে ॥

॥ শেষ তিমিরে ॥

প্রারম্ভিকী

মাফ্ করবেন। এই নাটকের মূল ঘটনার প্রায় সবটুকুই বাস্তব। চরিত্রের আমদানির মধ্যে মূল চরিত্রগুলোও বাস্তবের আমি, তুমি সবার মধ্যে থেকে নেয়া। বাস্তবের সাদা চোখে যে যা, নাটকে সাধ্যমত তাদেরকে সেই স্বীকৃতি দিয়েছি। ন্যায়-অন্যায়ের বিচার আছে। শিল্পের খাতির আর সত্য খোঁজার তাগিদে যদি সত্যই কোন অন্যায় হয়ে থাকে, তবে আবার বলছি—মাফ্ করবেন।

বরাট কলোণী
কলিঃ—২৮

নাট্যকার

॥ চরিত্রলিপি ॥

মৃত্যুঞ্জয় — জ্যোতি
কৃষ্ণ — ১ম বন্ধু
বিমল — ২য় বন্ধু
অশেষ — ৩য় বন্ধু
প্রমথ — যুবক

রাজাজী ॥ ম্যানেজার ॥ সাহানা ॥ নন্দিনী

—— ০ ——

[শহরের কলেজ পাড়া। একটা রেষ্টুরেন্ট। নাম দেওয়া যাক "মেলোডিয়া"। রেষ্টুরেন্টের তিনটে দেয়ালের সাথে তিনটে কাঠের প্লাটফর্ম দিয়ে ঘেরা 'লেডিজ-সিট'। পর্দা আড়াল করা, কাঠদিয়ে ঘেরা ঘরগুলো সাধারণ রেষ্টুরেন্টের মত নয়। কিছুটা বড়। প্রত্যেকটা ঘরের মাথায় ওপর ছোট বোর্ডে—সাদা হরফে লেখা 'রিজার্ভ'। এরই এক ফাঁকে 'ক্যাশকাউনটার'। সামনের ফাঁকা জায়গায় তিনটে টেবিল। প্রত্যেকটা টেবিলের সঙ্গে চারটে করে চেয়ার লাগানো। সময়টা সন্ধ্যে পার হয়ে গেছে। মঞ্চের ডান দিক থেকে বাঁ দিক পর্যন্ত সিট এবং 'লেডিজ-সিট'কে যথাক্রমে ১, ২, ৩ নম্বর ঘর ধরলাম। পর্দা উঠতেই দেখা যাবে ১ নম্বর সিটে অশেষ এবং প্রমথ বসে আছে। মাঝের সিটটা খালি। (তবে অভিনয় চলা কালীন নির্দেশ অনুযায়ী এক সময় তিন বন্ধু প্রবেশ করে মাঝের সিটটা দখল করবে) ৩নং সিটে কৃষ্ণ একা, উন্মনা হয়ে বসে আছে। সাজসজ্জায় নবাবীয়ানা আছে। সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১নং 'লেডিজ-সিট'টা পর্দা দিয়ে আড়াল করা। মনে হয় ভেতরে লোক আছে। মাঝের 'লেডিজ-সিট'টার পর্দা পুরোপুরি আড়াল নয়। তাতে বোঝা যায় লোক নেই। এ ছাড়া সাধারণ রেষ্টুরেন্টে যেমন প্রয়োজনীয় সামগ্রী থাকে এই মঞ্চেও তাই থাকবে। মাঝে মাঝে খালি চেয়ারে দু'একজন আসবে। চা কিংবা কফি খেয়ে যাবে। বিমল আর মৃত্যুঞ্জয় একসাথে বাইরে থেকে আসতেই কৃষ্ণ উঠে দাঁড়ালো—]

কৃষ্ণ ॥ [বিমলের প্রতি] হ্যালো বোস, কি খবর ?

বিমল ॥ [সেক্ হ্যাণ্ড করে] ভাল। তুই এখানে ?

কৃষ্ণ ॥ এখানেই আমার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। [সবাই চেয়ার টেনে জেঁকে বসে] তারপর মৃত্যু, তুই হঠাৎ বেপাড়ায় ? তোর তো এটা আস্তানা নয়।

মৃত্যু ॥ কেন, আপত্তি আছে নাকি ?

কৃষ্ণ ॥ আপত্তি থাকবে কেন! কিন্তু হঠাৎ আমার আঙ্গিনায় —বড় আশ্চর্য লাগছে।

বিমল ॥ তুই এমন ভাব দেখাচ্ছিস—যেন এই 'মেলোডিয়া'টা তোর কেনা কালের সম্পত্তি।

কৃষ্ণ ॥ ডেফিনিট্—। এখানকার অনেক টেম্পোরারী মালিক আছে। তার মধ্যে আমিও একজন। ইচ্ছে করলে তোরাও হতে পারিস; অবশ্য এরজন্যে বিশেষ কোন টাকা-পয়সার দরকার হবে না। ডেলি কিছু ক্যাশ [রাজা নাম ধারী একজন বয় আসে।] এই রাজাজীর হাতে দিতে পারলেই হ'ল—কি বল রাজাজী ? [রাজাজী ঘাড় নাড়ে।] বল্— কি খাবি ? [কেউ কিছু বলে না] হুঁ, আবার ফরমালিটি। আচ্ছা রাজাজী, তিন কাপ কফি।

মৃত্যু ॥ তোর আড্ডা তা হ'লে—

কৃষ্ণ ॥ এখানেই—। তবে মাঝে মাঝে অফ্ যায়—বিশেষ করে মাসের শেষ দু'তিন দিন। তা ছাড়া সবদিন এখানেই পাবি [কিছুক্ষণ থামে] তা, মহারাজেরা কফি হাউস ছেড়ে এখানে আগমন কি উদ্দেশ্যে ?

বিমল ॥ উদ্দেশ্য মহৎ নিঃসন্দেহে—একটু পালিশ করে ঘণ্টা কয়েক গ্যাজাবো। কফি হাউসে বড্ড ভীড়—

মৃত্যু ॥ প্রাণের কথা ওখানে হাজার লোকের হাজার কথার মাঝে হারিয়ে যায়।

কৃষ্ণ ॥ প্রাণের কথা। প্রাণের কথা মানে তো প্রেমের কথা।

তা ফেঁয়াসী ছাড়া প্রাণের কথা কার সঙ্গে রে ? এই বিমলে ওরফে ভূতোর সঙ্গে ? হাসালি মৃত্যু ! না, তোর বাপ অনেক বুঝেসুঝেই তোর নাম রেখেছে। মৃত্যুকে সত্যি তুই জয় করতে পারবি। [হঠাৎ মৃত্যুর সারা শরীরটার দিকে কৌতুক দৃষ্টিতে তাকায়।] হ্যারে মৃত্যু,—তুই যেন দিনের পর দিন কেমন উদাসীন, মানে কেমন যেন মেয়েলি-মেয়েলি হয়ে পড়ছিস। কি ব্যাপার বল তো ? ধাক্কা-টাক্কা খেয়েছিস নাকি ?

মৃত্যু ॥ কি করে বুঝলি ?

কৃষ্ণ ॥ সাইকোলজির থিওরি না জানলেও প্রাক্টিক্যাল জ্ঞান কিছুটা আছে। তুই যে ধাক্কা খাওয়া স্যাম্পেল্ তার স্পষ্ট প্রমাণ তুই গেঞ্জিটা উল্টো পরেছিস। [মৃত্যু লজ্জা পায়।]

মৃত্যু ॥ ওটা তাড়াতাড়িতে—

কৃষ্ণ ॥ তাড়াতাড়িতে ঠিক দেখতে পাসনি—তাইতো ?

মৃত্যু ॥ হ্যাঁ।

কৃষ্ণ ॥ তা এবারে তাড়াতাড়িতে—এক কাজ কর না ; না দেখে-শুনে একটা মেয়ের বদলে একটা ছেলেকে বিয়ে করে—ফেল ব্যাস্ ! [সকলে হেসে ওঠে, কৃষ্ণ এই ফাঁকে পকেট থেকে দামী সিগারেট কেস বার করে তা থেকে নিজের মুখে একটা সিগারেট রাখে তার পর কেসটা ওদের দিকে এগিয়ে দেয়।] নে সিগারেট খা। [দু'জনে সিগারেট নিল। কেসটা পকেটে রেখে লাইটার বের করে সবাইকার সিগারেটে আগুন দিয়ে নিজে ধরায়। তারপর লাইটারটা পকেটে রাখে এবং একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে—] দেখ. মৃত্যু, ভাব বৃন্দাবনে 'হা রাধিকা, হা রাধিকা' করে বুক ফাটালে কোন রাধিকার হৃদয় গলবে না। বস্তুতন্ত্র যুগের মানুষ আমরা। কাজেই প্রেমকর্মে আইডিয়ালিষ্ট প্যাটার্নকে

কাজে লাগালেই চরম ব্যর্থতা। তোরা আইডিয়ালিস্টরা প্রেম সম্বন্ধে যত বড় কথাই বল্ না কেন, আমার কাছে 'ফেলো কড়ি মাখো তেল'। তা যাক্, বাছাধন—কি এমন প্রাণের কথা যা কফি হাউসে সম্ভব নয় ?

বিমল ॥ সে সব অনেক কথা। কি বলিস রে ?

(মৃত্যু ঘাড় নাড়ে)

কৃষ্ণ ॥ কেমন ?

বিমল ॥ একনম্বর—বিষয়টা একেবারে ব্যক্তিগত। ছ'নম্বর—কথাটা হচ্ছে, সাহিত্যের কয়েকটা টুকরো দিক নিয়ে এ্যাট্ র‍্যান্ডাম গাঁজাবো।

কৃষ্ণ ॥ [একটু ভেবে, গম্ভীর হয়ে] এক নম্বরটা বেশ ইন্‌টারেস্টিং। 'ব্যক্তিগত' কথাটাও বেশ রোমান্টিক। কিন্তু দু'নম্বরটা বড্ড খাপছাড়া। ঠিক ইংরিজি ছবি দেখতে বসে, দর্শকদের হাসতে দেখে না বুঝে হাসিতে যোগ দেয়ার মতন। সুতরাং ওখান থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলাম। এখন ব্যক্তিগত কথাটা শুনতে আপত্তি নেই—কেন না, হাতে বেশ কিছুটা সময় আছে। [ঘড়ির দিকে তাকিয়ে] আমার পার্টনারের আসতে এখনো মিনিট পনের বাকী; দাঁড়া, আমি একটু আসছি। [কৃষ্ণ ক্যাস কাউণ্টে গিয়ে ম্যানেজারের হাতে মাঝের ঘরটা রিজার্ভ করার জন্য কয়েকটা টাকা দেয়।]

মৃত্যু ॥ [চুপিচুপি] হ্যাঁরে, কৃষ্ণ ইউনিভার্সিটিতে যেসব কথা বলে, কাজেও তাই করে নাকি ?

বিমল ॥ ওর কোন কথাটা সত্যি, আর কোনটা মিথ্যে, তা বোঝা মুস্কিল। কিন্তু যার জন্যে এলাম—

কৃষ্ণ ॥ [ফিরে এসে] হবে। তবে পনের মিনিট আমি কি করে কাটাবো বল্ ? [রাজাজী কফি দিয়ে যায়।] নে কফি খা। পনের মিনিট পর আমি আমার ঐ রিজার্ভ-

সিটে ঢুকবো। তখন তোমরা তোমাদের ব্যক্তিগত প্রেম-আলাপন শুরু ক'রো।

বিমল ॥ হ্যারে কৃষ্ণ, তুই কি নামে আর কাজে এক নাকি ?

কৃষ্ণ ॥ সেটা কি বারবার বলতে হবে ? বাবার দেয়া নাম। নামের মাহাত্ম্য তো আর অস্বীকার করা যায় না! যাক্, কাজকর্মের কথা বল্।

মৃত্যু ॥ কাজ! এই সমস্যার যুগে কাজ কিসের ?

কৃষ্ণ ॥ ধ্যাৎ, আরে কাজ মানে আমি বেকার সমস্যার কথা বলছি না। চাম্পু সমস্যার কথা বল্।

মৃত্যু ॥ চাম্পু মানে ?

কৃষ্ণ ॥ ও—ওটা আবার তোদের ডিক্‌শেনারীর ভাষা নয়। চাম্পু কথাটার সাধুভাষায় অর্থ হচ্ছে 'প্রেম'—চলতি ভাষায় পটানো।

বিমল ॥ একটু রয়ে সয়ে বল্। এই রকম ডিরেক্ট এ্যাটাক্ সইতে পারবো না যে!

কৃষ্ণ ॥ পোষাকী ভাষাতো অভ্যাস করিনি। না! তোদের সঙ্গ থেকে সরতে হবে দেখছি।

বিমল ॥ [হাত জোড় করে] সরতে হবে না দেব, তবে মুখটা একটু কম করে ছোটাও, তা হলেই—

কৃষ্ণ ॥ ঠিক আছে, আমার কথা শুনিস্ না।

মৃত্যু ॥ চোটছিস্ কেন ?

কৃষ্ণ ॥ কোথায় ?—ঐ চটা-ফটা আমার দ্বারা হবে না। কৃষ্ণ-চন্দ্রকে তোরা চিনিস না।

মৃত্যু ॥ খুব চিনি! তুমি একটা গ্রেট্ গ্যাসবাজ।

কৃষ্ণ ॥ ধন্যবাদ্! তুই তা হ'লে ধরেছিস। আসল কথাটা চাপা পড়ে যাচ্ছে,—বলছিলাম যে প্রেমের কথা বল্।

বিমল ॥ [হেসে রসিকতা করে] প্রেম! কার সঙ্গে করবো ?

তাছাড়া এই ঘাটের মরা শ্রীমানের মত ছেলেকে কে প্রেম নিবেদন করবে বল্?

কৃষ্ণ ॥ চেপে বস্। আরে এই রকম শ্রীমানের জন্যে কত চাম্পু—sorry—মানে কত মেয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে আছে। তবে একটু খেটেখুটে খুঁজেপেতে নিতে হয় আর কি।

বিমল ॥ এ সব কথা তোর পক্ষেই সম্ভব।

কৃষ্ণ ॥ একশোবার। কিন্তু তোদের এই বিরস বদন দেখে ভীষণ দুঃখ হয়। তোরাও পিছিয়ে থাকবি, এ কোন মতে বরদাস্ত করা যায় না।

বিমল ॥ প্রেম করা বা প্রেমে পড়া এক বিশেষ ধরণের আর্ট। সেই আর্টে বৎস তুমি জয়ী—ইউনিভার্সিটির সব ক'টি মেয়েকে একচেটিয়ে করে রেখেছ।

কৃষ্ণ ॥ [তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে] সে কিরে! ইউনিভার্সিটিতে মেয়ে কৈ? মেয়েদের সঙ্গে মিশলেই প্রেম হয় না—আসলে কাজ করতে হয়। আর এটাও ঠিক যে, ইউনিভার্সিটিতে যারা আছে তাদের একটাকেও পাতে দেবার মত নয়।

মৃত্যু ॥ একটু ভদ্র হ'।

কৃষ্ণ ॥ উপায় নেই—এটা একেবারে Instinct-জাত। তুই একটু বাদ সাদ দিয়ে শোন্, তাহলেই হবে। বাবা মৃত্যু, তুমি তো প্রেমের কবিতা বেশ বড় বড় ভাষায় লেখ—সেকেণ্ড ব্রাকেটে, যার একটাও কাজে লাগে না। তাই বলি হে প্রেমিক কবি, বাস্তবের প্রাকৃটিক্যাল অভিজ্ঞতা কিছু আছে কি?

মৃত্যু ॥ মাফ্ কর ভাই।

কৃষ্ণ ॥ লজ্জা পেলি নাকি? তবে শোন্ একটা সাজেশন্ দিই।

মৃত্যু ॥ বল্।

কৃষ্ণ ॥ [গম্ভীর হয়ে] একটা বিয়ে করে ফেল। তোর কষ্ট তোর বাপ্ ঠিকই বুঝবেন। কেননা এটা ভুলে যাসনি যে, তোর

বাপেরও এক কালে তোর মত একটা বয়েস ছিল। তাই বাবাকে তোর ঐ কবির ভাষায় ইনিয়ে বিনিয়ে ভাল করে বুঝিয়ে বল্। সোজা কথায় খানিকটা তেল মাখিয়ে একটা সোনামুখ বৌ ম্যানেজ কর্। তারপর প্রিয়ার অঙ্গে মাথা রেখে, সোনা মুখের দিকে চেয়ে সারাদিন কবিতা লিখবি। তারপর রাতের বেলায় দাপাদাপি করে খাট ভাঙবি। [সিগারেটের শেষটুকু এ্যাসট্রেতে গুঁজে মুখ বিকৃত করে বলে] মৃত্যু! তুমি নিটোল মৃত্যু। একেবারে গজা দি গ্রেট।

মৃত্যু ॥ দোহাই কলির কৃষ্ণ আমাকে তোমার প্রেমতত্ত্বের খেতাব থেকে তুলে নিয়ে তোমার নিজস্ব বিগ্রহটি সেই স্থলে প্রতিষ্ঠা করো।

বিমল ॥ হ্যারে, তুই যে এই রকম করিস বা এত শুদ্ধ ভাষায় কথা বলিস, তাতে লজ্জা কিংবা ভয় করে না?

কৃষ্ণ ॥ লজ্জা! লজ্জা তো মেয়েদের হয়; [জামার কলার উল্টে] আর ভয় এই কৃষ্ণচন্দ্রের—'আমি কি ডরাই কভু ভিখারী রাঘবে।' [রাজা কফির কাপ নিতে আসে। কৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে বিলের পয়সাটাও দিয়ে দেয়] আমিই দিয়ে দিলাম।

বিমল ॥ ধন্যবাদ।

কৃষ্ণ ॥ [ঘড়ি দেখে] কি ব্যাপার এখনো আমার পার্টনার আসছে না কেন?

মৃত্যু ॥ মেয়ে না পুরুষ?

কৃষ্ণ ॥ ভগবান কৃষ্ণের ক'টা পুরুষ বন্ধু ছিল রে? তার ওপর আবার এই [নিজেকে দেখিয়ে] কলির কৃষ্ণের পুরুষ বন্ধু! এই ধর-তক্তা মার পেরেকের যুগে পুরুষদের অযথা সঙ্গ দান করে সময় নষ্ট করার মত সময় আমার নেই।

বিমল ॥ গ্যাস্ কমা।

কৃষ্ণ ॥ এখুনি প্রমাণ পাবি।

মৃত্যু ॥ যতক্ষণ না তোর পার্টনার আসে ততক্ষণ কমনরুম চুট্‌কী ছাড়্‌।

কৃষ্ণ ॥ কমনরুমের কথা কমনরুমে হবে। ওসব এখন বাদ দে। মুড নেই। তার চেয়ে বরং এখানকার কথা শোন— সাহিত্যের অনেক মালমসলা পাবি। আচ্ছা তোরা তো বলিস আমরা অর্থাৎ এই বাঙালীরা অত্যন্ত কন্‌সারভেটিভ্‌ জাত! কথাটা কি সত্যি?

বিমল ॥ আমার তো তাই মনে হয়।

কৃষ্ণ ॥ আমার কি মনে হয় জানিস? মনে হয় আমেরিকা বা ইতালীর যুবক-যুবতীদের স্বাধীনতার সঙ্গে আমাদের দেশের যুবক যুবতীদের কোন পার্থক্য নেই।

মৃত্যু ॥ কেমন?

কৃষ্ণ ॥ বুঝলি না?

মৃত্যু ॥ না।

কৃষ্ণ ॥ [দুঃখ পায়] না। তোদের মনোভাব এখনো মধ্যযুগীয় রয়ে গেছে। [জোর গলায়, কাব্য করে] পরিশোধন কর্‌ —ওরে পরিশোধন কর্‌—নইলে পস্তাবি।

বিমল ॥ বাজে কথা না বলে আসল বক্তব্য বল্‌।

মৃত্যু ॥ পশ্চিমের ছেলে-মেয়েরা কত দিক দিয়ে কত রকম সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। কথা বলা, চলা-ফেরা, নিজের পছন্দ মতন বিয়ে করা, প্রেম করা—না ভাল লাগলে ছেড়ে দেওয়া, জীবনের চলার পথে নিত্য-নতুন সঙ্গিনীর সঙ্গ পাওয়া ইত্যাদি যতটা স্বাধীনতা পাওয়া দরকার, শা প্রায় সবই পেয়ে থাকে।

বিমল ॥ [রসিকতা করে] তাই নাকি!

কৃষ্ণ ॥ বটে!

মৃত্যু ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ মশাই। আর পশ্চিমের সেই রঙের ছোঁয়াচ

পরাতত্ত্বে বিশ্বাসী এই বাঙালী যুবক-যুবতীদের মনে-প্রাণে নতুন আন্দোলন এনেছে।

মৃত্যু ॥ কোন্ কোম্পানীর (গ্যাস)?

কৃষ্ণ ॥ শ্রীকৃষ্ণ কোম্পানী, but not private limited. [একটু থামে] একটু ধৈর্য ধর্—খানিক পরে প্রমাণ দেব। জানিস—১০৮টা নারীর সঙ্গে সঙ্গ দান করবো বলে শপথ নিয়েছি। হিসেবের খাতা উল্টালে দেখবো হাফ্ সেন্‌চুরি পার হয়ে গেছে।

মৃত্যু ॥ একটু কম ছাড়্।

কৃষ্ণ ॥ ঐ তো তোদের বদ অভ্যাস। যা সত্যি, তা তোরা বিশ্বাস করবি না—যা মিথ্যে, তার জন্যে তোর প্রাণ দিবি। তোরা ক্লাস করিস অধ্যাপকদের নোট হবার জন্যে, ভাল ছেলে বন্‌বার জন্যে। অথচ জীবনে চলার পথে এগুলো কোন কাজে লাগে না। আর আমি ক্লাস ফাঁকি দিয়ে কমনরুম-বাজী করি জীবনকে ভোগ করার জন্যে। প্রাচুর্য আমার জন্যে। প্রফেসারদের মুখে মুখে তোদের নাম শুনি। কিন্তু এই নগর-জীবন সম্বন্ধে তোদের অভিজ্ঞতা এতটুকু বেড়েছে কি? জানিস নিজেদের বিলিয়ে দেবার মত বেশ খানদানি ঘরের হাজার হাজার মেয়ে আছে। তারা খালি সুযোগ খোঁজে। আমাদের উচিৎ ধরো, খেয়াল চরিতার্থ করো, মজা লোটো, ছেড়ে দাও। আদর্শগত প্রেমের কথা অনেক শুনেছি, অনেক দেখেছি, সবই ফাঁকা।

বিমল ॥ যা বেটা, ফুট কাটিসনি।

কৃষ্ণ ॥ তোরা সব ছেলে মানুষ! ঐ যে, ঐ দিকে চেয়ে ছাখ্। ছাখ্ তো ওপরে কি লেখা আছে?

মৃত্যু ॥ রিজার্ভড্।

কৃষ্ণ ॥ ইচ্ছে করলে দু'ঘণ্টার জন্যে ঐ ঘরে, একটা মধুর অস্থায়ী বাসর পাত্‌তে পারিস্। একটাকা দিলে ঐ সুরম্য পর্দা

এতটুকুও নড়বে না। এমন কি একটা মশা পর্যন্ত পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারবে না। ব্যস্, তারপর ওর ভেতরে তোমার প্রেমিকাকে নিয়ে যা-খুশী তাই কর, কেউ তাতে আপত্তি তুলবে না। খালি রাজাজীকে বলে রেখো— "দু' ঘন্টি বাদ আনা।" তারপর তোমার ঐ রাজত্বে তুমি তোমার রাণীকে নিয়ে হাবুডুবু খাও—কেউ দেখবে না, কেউ কোন আপত্তিও করবে না।

[সাহানা অপূর্ব সাজে প্রবেশ করে। চারিদিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকাতে থাকে। কৃষ্ণের সে দিকে চোখ পড়তেই বন্ধুদের প্রতি—] আই এ্যাম্ সরি। [বন্ধুরা অবাক্ হয়।] সাহানা! [কৃষ্ণ খানিকটা এগিয়ে যায়] সাহানা আমি এইখানে। তোমার জন্যে কতক্ষণ অপেক্ষা করে আছে ডারলিং। তুমি ঐ মাঝের ঘরে বসো। আমি রিজার্ভ করে রেখেছি। তুমি একটু বসো, আমি আসছি। [রাজাজীকে ডেকে বলে] রাজাজী, দো ঘড়ি বাদ আনা।

রাজাজী॥ [সেলাম ঠুকে] জী সাব্।

[কৃষ্ণ একটা টাকা হাতে দেয়। হাসিমুখে রাজাজী টাকা নিয়ে ফিরতি সেলাম ঠুকে চলে যায়।]

সাহানা॥ দেরী করো না কিন্তু। আমায় আজ তাড়াতাড়ি যেতে হবে। দেরী হলে বাবা আবার ভীষণ রাগ করবেন।

কৃষ্ণ॥ না ডারলিং—ঠিক সময়েই তোমাকে ছেড়ে দেবো। [সাহানা পর্দার আড়ালে অন্তর্হিত হ'ল। কৃষ্ণ বন্ধুর টেবিলে এসে।] আচ্ছা dear friends এবার আমার ছুটি। তোরা বস্।

[কৃষ্ণ মৃত্যুর পিঠ চাপড়ে মাঝের ঘরে পর্দার আড়ালে অন্তর্হিত হ'ল। বন্ধুরা অবাক্ হয়ে কৃষ্ণের চলে যাওয়া লক্ষ্য করে। এক নম্বর সিট থেকে অশেষ এবং প্রমথের কথা শোনা যায়]।

প্রমথ ॥ ব্যাপারটা কেমন অদ্ভুত, তাই না? যাই বল, ছেলেটা লেখাপড়ায় বেশ ভাল। আসল ব্যাপারটা কিন্তু কেউ জানে না। ছেলেটা একটা খৃষ্টান মেয়েকে ভালবাসতো। মেয়েটা বেশ ধনী ঘরের। একদিন মেয়েটার বাবা ছেলেটাকে রাস্তার ওপর খুব অপমান করে। তাছাড়া মেয়েটা ছেলেটার চোখের সামনে এমন সব দৃষ্টিকটু অমার্জনীয় কাজ করেছে—যা সত্যি সহ্য করা যায় না।

অশেষ ॥ আচ্ছা, ও স্বাভাবিক জীবন থেকে এভাবে সরে এলো কেন?

প্রমথ ॥ প্রথম কথা, মেয়েদের সম্বন্ধে ওর একটা ভাল ধারণা ছিল। খৃষ্টান মেয়েটা সেই ধারণার উপর আঘাত করেছে, যার ফলে অন্য কোন মেয়ের ওপর আর ভরসা নেই।

অশেষ ॥ আমি লক্ষ্য করেছি ছেলেটা ভীষণ এ্যাম্বিসায়াস্—ভাল-ভাল সব idea ওর মধ্যে কাজ করতো।

প্রমথ ॥ হ্যাঁ। যে idea গুলো অনায়াসে কাজে লাগাতে পারতো।

অশেষ ॥ ঠিক কথা। ব্যাপারটা দেখ, তুই মেয়েটার সম্বন্ধে ছেলেটার মধ্যে কোন্ একটা ভাল সেন্টিমেন্ট কাজ করাতে পারবি না? কে জানে এটাই হয়তো ওর চরিত্রের 'ফ্রেইলটি'।

প্রমথ ॥ আমারও তো তাই মনে হয়।

অশেষ ॥ তা হলে তুই বলছিস—ওর এই পরিবর্তনের জন্যে ঐ খৃষ্টান মেয়েটাই দায়ী।

প্রমথ ॥ পুরোপুরি বলা চলে না। কিছুটা সমাজের আছে। দেখ, এই সব আলোচনা অত্যান্ত কনট্রাডিক্টারী। এ বিষয়ে বলা যায়—খৃষ্টান মেয়েটা ইচ্ছে করলে ছেলেটাকে মেনে নিতে পারতো। মেয়েটা তা পারেনি; তার কারণ—বস্তুগতভাবে মেয়েটার যা প্রয়োজন তা ছেলেটা মেটাতে পারতো না। গাড়ী, বাড়ী, সাজ-সজ্জা ইত্যাদির কোনটাই নয়; কেবল একটা জিনিষ ছাড়া।

অশেষ ॥ সেটা কি ?

প্রমথ ॥ ছেলেটার একটা রমণীমনোলোভা রোমান্টিক ফিগার ছিল —তাই দেহগত সুখভোগ অর্থাৎ সেক্সচুয়াল এনজয়মেণ্টে সহজেই যোগ দিতে পারতো। মেয়েটা এর জন্যে অনেকবার ছেলেটাকে 'অফার' ও করেছিল। কিন্তু—[বিমল আর মৃত্যুর কথা শোনা যায়—রাজাজী আবার কফি দিয়ে যায়। কফি খেতে খেতে কথা চলে।]

মৃত্যু ॥ কিন্তু আমি আশ্চর্য হচ্ছি—

বিমল ॥ গুলি মারো ওসব কথায়! এখন তুই যে কথা জিজ্ঞাসা করবি বলেছিলি, সে কথা—বল্।

মৃত্যু ॥ [একটু বিব্রত হয়। পরে নিজেকে ঠিক করে নিয়ে বলে] হুঁ! কিন্তু একটা সর্ত আছে।

বিমল ॥ বল্।

মৃত্যু ॥ এখানকার কথা এখানেই সীমিত থাকবে—বাইরে কাউকে এখানকার কথা প্রকাশ করতে পারবে না।

বিমল ॥ বেশ।

মৃত্যু ॥ আর আমি যা জিজ্ঞাসা করবো তার সত্য জবাবটুকু যেন পাই।

বিমল ॥ অন্য কারোর সম্পর্কে বলতে পারি না। [হেসে] তবে আমার সম্পর্কে আমি বলতে পারি—সত্য বৈ মিথ্যা বলব না। [ইতিমধ্যে তিনজন কলেজের ছেলে ২নং অর্থাৎ মাঝের টেবিলটা দখল করে নেয়। রাজাজী তাদের অর্ডার অনুযায়ী কফি আনতে যায়।]

মৃত্যু ॥ Good. আচ্ছা, নন্দিনীর সঙ্গে তোর কিসের সম্পর্ক ?

বিমল ॥ [একটু ইতস্ততঃ ভাব] হঠাৎ এ প্রশ্ন ?

মৃত্যু ॥ অনেক দিন ধরে সামনা সামনি এই প্রশ্নটা করবো ভেবেছিলাম, তবে সুযোগের অভাবে—

বিমল ॥ [কথা থামিয়ে] এক কথায় 'সিস্টার-কাম-ফ্রেণ্ড'।

আফটার অল মেয়েটা মেশার মত মেয়ে তাই মিশি। 'জলি'—সবাইকার সঙ্গে হেসে কথা বলতে পারে—আর পাঁচটা মেয়ের মত নীরব নয়।

মৃত্যু ॥ না—আমি ঠিক তা জানতে চাইচি না, আমি বলছি নন্দিনীর প্রতি তোর কোন দুর্বলতা—

বিমল ॥ ক্লাসের অনেকে পাশ থেকে এই রকম ইঙ্গিত অনেক করেছে। তবে তুই জেনে রাখ্ নন্দিনীর প্রতি আমার কোন দুর্বলতা নেই। [একটু ইমোশ্যান্যাল হয়ে পড়ে] আশা-করি তুমি নৈতিক বিবাহ বিশ্বাস করো। জান, প্রেম বা বিবাহ মানুষের জীবনে একবারই হয়। আমার সে পাট চোকানো হয়ে গেছে আট বছর আগে। [মৃত্যুর হাতে হাত রেখে] নন্দিনীর সঙ্গে আমার অন্য কোন দুর্বল সম্পর্ক নেই. এটা তুমি অনায়াসেই বিশ্বাস করতে পারো।

মৃত্যু ॥ আমি তা বিশ্বাস করি। আর যখন পাশ থেকে চাপ আসে কিংবা নিজেকে যখন বিশ্বাস করতে পারি না, তখন সামনা-সামনি জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন অনুভব করি।

বিমল ॥ এই সরাসরি জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। [দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ] আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো?

মৃত্যু ॥ কি?

বিমল ॥ হঠাৎ এই ভাবে নন্দিনীর বিষয় নিয়ে, এই রকম একটা বেমক্কা প্রশ্ন তুললি কেন?

মৃত্যু ॥ [একটু বিরহী হাসি] এমনি!

বিমল ॥ আমার মনে হচ্ছে, ক্লাসের সম্পর্ক ছাড়া বাইরেও তোর আর নন্দিনীর একটা সম্পর্ক আছে—অন্ততঃ তোর কথায় তা প্রমাণ হয়।

[রাজাজী ২নং টেবিলে কফি দেয়। তিনজন হাসাহাসি করে খেতে থাকে। রাজাজী চলে যায়।]

মৃত্যু ॥ কেন, সেটা কি তুই জানিস না ?

বিমল ॥ জানি, তবে সেটা অস্পষ্ট।—

[মাঝের টেবিল থেকে কথা শোনা যায়।]

১ম জন ॥ এ ব্যাপারটা ক্লাসের সকলেই জানতো।

২য় জন ॥ যাই বলিস, দু'জনকে বেড়ে মানাতো। একজন ঠিক যেন রক্তকরবী আর রোল ১৯২ যেন রাজা।

৩য় জন ॥ [আচমকা প্রশ্ন করে] হ্যারে, ১৯২ যেন কি কাজ করে ?

১ম ॥ বেকার আর সাহিত্য টিউশনি করে কোন রকমে চালায়।

২য় ॥ রক্তকরবী'রও বলিহারী! প্রেম কর তো কর ঐ রকম একটা বেকার ছেলের সঙ্গে! কেন আর কি ছেলে ছিল না। [নিজেকে প্রতিপন্ন করে।]

৩য় ॥ আরে বেকার হলে কি হবে। একেবারে আগুন। পরে বুঝবি ওর মধ্যে কি আছে। রাজা ক্লাসে কম আসে বটে কিন্তু লেখাপড়ায় বড় সেয়ানা পার্টি।

১ম ॥ এ ছাড়াও যা লেখে বাংলা দেশের ক'টা সাহিত্যিক তা পারে বল্‌তো ?

৩য় ॥ তা যা বলেছিস।

২য় ॥ তা মাইরি, জমলো কি করে ? আমরা তো কত চেষ্টা করলাম। যবনিকাপাত হবার আগেই বুড়ো আঙ্গুল ঠেকালো।

৩য় ॥ কার মধ্যে কি আছে মেয়েরা তা ভাল করে বুঝতে পারে। আমরা যে ষাঁড়ের গোবর—[নিজেকে দেখিয়ে] এ জিনিষ যে কোন হোম-যোগ্যিতেও কাজে লাগে না—তা রক্তকরবী ভাল করেই বোঝে।

২য় ॥ পচা বলছিল প্রথমটা শুরু হয়েছিল বই দেয়া-নেয়া থেকে।

৩য় ॥ তারপর বই থেকে [কাব্য করে] ধীরে ধীরে হৃদয় দেয়া-নেয়া শুরু। হেবো, ছাড়াছাড়িটা কি করে হ'ল রে ?

২য় ॥ নাটকটা ক্লাইমেক্সে না উঠতেই নায়িকার এই পলায়নপর

দৃশ্যটিতে যেন ছন্দপতন ঘটলো। [দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ে] ক্লাসটাও এখন ঠিক মত জমে না। কেউ কারোর সঙ্গে কোন কথা বলে না।

৩য় ॥ যেন Soundless picture. নড়েচড়ে—তবে কথা বলে না।

১ম ॥ ব্যাপারটা কি জানিস ?

সকলে ॥ [ব্যগ্রভাবে]—কি ?

১ম ॥ গোয়েন্দাগিরি করে যতটুকু জেনেছি তাতে শেষটুকু হচ্ছে এই রকম—রাজা বিয়ে করতে চেয়েছিল, রক্তকরবী তাতে রাজী হয়নি। রক্তকরবীর গার্জেনের আপত্তি আছে।

২য় ॥ আরে আপত্তি তো থাকবেই। গার্জেনের আপত্তি না থাকলে আজকের প্রেমের বাজারে লটের দরে ছেলে মেয়েরা পার হয়ে যেত। এত রেশ্‌টিক্‌শনের জন্যেই তো আমাদের এই রকম সকরুণ হাহাকার। হ্যাঁরে, গার্জেনরা কি আমাদের এই ব্যথা বুঝবে না !

৩য় ॥ তোর ব্যথা কখনো তোর গার্জেন বুঝবে না।

১ম ॥ গলায় দড়ি দে।

২য় ॥ এই রকম করে বলবি ?

৩য় ॥ [চোখ পাকায়] হ্যাঁ বলবো ! কোথায় রক্তকরবীর কথা হচ্ছে আর হঠাৎ উনি কোথা থেকে উড়ে এসে গৌরচন্দ্রিকা শুরু করলেন। বস্ চুপ করে। হ্যাঁ—কি যেন আলোচনা হচ্ছিল ?

১ম ॥ ঐ গার্জেনের আপত্তি সম্বন্ধে।

৩য় ॥ হ্যাঁ—গার্জেন তো আপত্তি তুলবেই—তা না হলে তারা গার্জেন কেন। এটাই হচ্ছে তাঁদের ডিউটি। বলি যতই গার্জেনদের নিয়ে আপত্তি বিপত্তি দেখা যাক না কেন, তুই মেয়েতো বি. এ. পড়িস্ ! দেড়-মণি দেহের ওপর একটা ওয়েল ডেকরেটেড্ আড়াই সেরি মাথাও আছে। সেই

মাথাটা কত কষ্ট করে রোজ ব'য়ে নিয়ে বেড়াস। নিজের ভালমন্দ বুঝে সেই মাথাটাকে কাজে লাগাতে পারিস না?

২য় ॥ সবাই তোর ফরমূলা বুঝলে, আমাদের এই রকম—

১ম ॥ [চোখ রাঙিয়ে] আবার—

২য় ॥ না!—

[বাইরে থেকে এক দীর্ঘকায় যুবক প্রবেশ করে মাঝের টেবিলে এলো। নাম জ্যোতি; টেবিলের যুবকদের বন্ধু।]

জ্যোতি ॥ কি ব্যাপার, তোরা এসে গেছিস!

২য় ॥ কেন, অন্যায় করেছি নাকি।

জ্যোতি ॥ মোটেই না। তা-কি কথাবার্তা হচ্ছিল?

২য় ॥ আমাদের রাজা রক্তকরবীর। [জ্যোতি নাক সেঁটকায়।]

৩য় ॥ কিরে, নাক সেঁটকাচ্ছিস যে?

জ্যোতি ॥ এই পুরোনো বিষয় নিয়ে প্যান্‌প্যানানি করতে ভাল লাগে! অন্য টপিক্ পেলি না?

[রাজাকী এসে চায়ের অর্ডার নেয়]

এক কাপ শুধু চা।

১ম ॥ পুরোনো হলেও বেশ রস আছে।

জ্যোতি ॥ ভাগ্ ভাগ্।

৩য় ॥ আচ্ছা জ্যোতি, রক্তকরবীর ওপর তুই এত চটা কেন?

জ্যোতি ॥ চটার মত বলে তাই। রাজা নেহাৎ লিখতে পারে—তাই এযাত্রায় বেঁচে গেল। নইলে আর পাঁচটার মত রেলের লাইন খুঁজতে হ'ত।

২য় ॥ রাজার ওপর এত দরদ! ও যদি মেয়েছেলে হ'ত, তা হলে কি করতিস?

জ্যোতি ॥ তোকে একটা কথা বলি, উত্তর দে। রাজার সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে তোর কতটুকু জ্ঞান আছে? কিছু না। জানিস, রাজা ওর বাড়ী ছেড়ে চলে এসেছে বার বছর বয়েসে। লক্ষ্যপথ এক—বড় হবো, ডক্টরেট হেবো—সাহিত্যিক

হবো। যে চেতনা আমাদের কারোর মধ্যে নেই—বাপ মাসে মাসে ঠিক সময়ে টাকা পাঠায় তাই ফুর্তি করে মজা করে আনন্দে দিব্বি চলে যায়। আর রাজা? রাজা দস্তুর মত স্ট্রাগেল করে। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজে চলে—কারোর মুখাপেক্ষী নয়।

২য়॥ তোকেও একটা কথা বলি জ্যোতি—রাজার মত ছেলের জীবনে রক্তকরবীর মত মেয়ে আসায় ও ধন্য হয়েছে। রক্তকরবীর কি কম গুণ আছে নাকি।

[রাজাজী চা দিয়ে চলে যায়।]

জ্যোতি॥ থাম্ থাম্। কথা বলিস না। রাজার জীবনে রক্তকরবী আসায় রাজা যে ধন্য হচ্ছে তা খুব সত্য। কিন্তু ওর চলে যাওযায় রাজা কতখানি যে আঘাত পেয়েছে তা জানিস? আর রক্তকরবীর গুণের কথা বলিসনা। [চায়ে চুমুক দিয়ে] রূপ দেখে মানুষের প্রশংসা করার অভ্যাসটা ছাড়। জীবনে ওটা কোন কাজে লাগে না। রক্তকরবীর রূপ একটা আছে জানি—লোক দেখানো কতকগুলো গুণও আছে, তা মানি। তবে ভেতরটা একেবারে শুক্‌নো।

২য়॥ কি বলতে চাস তুই?

জ্যোতি॥ বলতে চাই এরা হচ্ছে আমাদের অগ্রণী সমাজের বুক ফুলিয়ে চলা মেয়ে। অন্যকথায় 'সোসাইটি গার্ল'। রোজ চারটে করে শাড়ী বদলায়। ওপরের রূপে জগৎ কেনে। সবাইকার সঙ্গে 'ফ্র্যাঙ্ক' হতে পারে।—

৩য়॥ দেখ্, রাজার বিষয়ে তোর এতটা 'ইম্পালসিভ্' হওয়ার কোন মানে হয় না।

জ্যোতি॥ একশো বার হয়। এই গারলের দেশে একেতো প্রতিভা জন্মায় না। তা যাওবা দু'একটা জন্মায়, তার বিকাশের আগেই ওরা দলিয়ে মেরে দেয়।

১ম॥ তা হলে তুই রক্তকরবীরই দোষ দিচ্ছিস?

জ্যোতি ॥ [সামলে নিয়ে] দোষ আমি কাউকে দিচ্ছি না। রাজার ওপর আমি অনেক ভরসা রাখি—ওর প্রতিভা যদি নষ্ট হয়, তবে বন্ধু হিসেবে অন্তত আমি যে কতখানি বেদনা পাব তা তোরা অনুভব করতে পরবি না। [কিছুক্ষণ পর] রাজাকে আমি কত করে বলেছিলাম—দেখ্ সাবধানে চলবি—কিন্তু—কিন্তু—

৩য় ॥ কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে, ওর গার্জেন কোন—

জ্যোতি ॥ গুলি মারো গার্জেনদের। সোসাইটি—গার্লদের আবার গার্জেন। ঐসব গার্জেনদের গুলি করে মারা উচিত্। কো-এডুকেশন কলেজে মেয়েকে পাঠিয়েছে—উপযুক্ত শিক্ষা না দিয়েই! ওরা আবার অভিভাবকগিরি করে বলে কিনা—প্রেম জিনিষটা মোটেই ভাল নয়। আজ যদি ঐ মরা রাজার বদলে অন্য কোন জমিদারের ছেলের সঙ্গে হ'ত তা হলে গার্জেনেরা মনে মনে বলতো—ঐ জন্যেইতো মেয়েকে কো-এডুকেশনে পড়তে পাঠিয়েছি। জামাই পাচ্ছি ভাল—খরচা মোটেই লাগলো না। (থেমে) পারি আমরা আমাদের বোনেদের এইভাবে ছেড়ে দিতে?

১ম ॥ তা বলে যার কিছু নেই তার সঙ্গে—

জ্যোতি ॥ সেই জন্যেইতো বলছি, যে গার্জেনের নিজের মেয়ের সম্পর্কে কোন ধারণা নেই সে গার্জেনের মেয়ে যাবে গার্লস কলেজে অথবা morning কলেজে।—আর তাই যদি হ'ত, তবে আমাদের সমাজের কি এই চেহারা হ'ত? কেনই বা রাজার মত ছেলে আজীবন সাফার করবে—আর কেনইবা—যাক্ অন্য কথায় আয়—

[মৃত্যু আর বিমলের কথা শোনা যায়।]

মৃত্যু ॥ হ্যাঁ—যে কথা বলছিলাম। বলছিলাম যে নন্দিনীকে আমি বলেছিলাম—কি যেন—

বিমল ॥ বিয়ের কথা।

মৃত্যু ।। হ্যাঁ। বলেছিলাম—"দেখো আমার যে goal তাতে পৌঁছতে গেলে সত্যি তোমায় আমার দরকার আছে। তাই বলছি আমাদের মধ্যে একটা পারমানেন্ট সেটেলমেন্ট হওয়া দরকার। রেজিস্ট্রেশনটা করতে তোমার আপত্তি আছে?

বিমল ।। নন্দিনী কি বললো?

মৃত্যু ।। বললো—বিয়েটা কি না করলেই নয়। এভাবেই চললে হবে। বিয়ে ছাড়া আমি সব কিছুতেই তোমার। আমি বললাম, আমার আদর্শের কাছে সেটা মস্ত অপরাধ। আগে রেজিস্ট্রেশন, তারপর প্রাণ খুলে মিশবো। এতে এই সুবিধা হবে—কোনকিছু বিপদ কিংবা কোন অসুবিধাতে রেজি-স্ট্রেশন সার্টিফিকেট থাকলে 'ডাইরেক্টলি কেস' করা যায়।

বিমল ।। তারপর?

মৃত্যু ।। ও বললে—ভেবে দেখি।

বিমল ।। তারপর?

মৃত্যু ।। এর পর থেকে নন্দিনী আমার আরো কাছে এলো। নিবিড় করে ধরা দিল।

বিমল ।। দেখ্ মৃত্যু,—আমার কি মনে হয় জানিস? আমার মনে হয় আমাদের মত গরীব ছন্নছাড়াদের প্রেম মানায় না। মানালেও মেলে না। বিশেষ করে বড়লোকের মেয়েদের সাথে তো নয়ই। আমাদের নিয়ে ওরা এক এক সময় 'ফার্স' করে। রাগ করিস না, কথাটা একটু তেতো হবে,—আমার মনে হয় নন্দিনী হয়তো 'ফার্স'ই করেছে।

মৃত্যু ।। অসম্ভব! কি করে তা হয়। আমি মেলামেশায় আপত্তি তুলবার পরেও সে আরো কাছে এসেছে। হাতে হাত রেখে চলেছে। আমি ঘরে একলা, খাটে দুপুর বেলায় শুয়ে থাকার সময় ও চুপি চুপি আমার পাশে এসে শুয়েছে —এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যা অনেকেরই জানা। আমি যে বাড়ীতে থাকি সে বাড়ার সবাই জানতো নন্দিনী

আমার স্ত্রী। আমার আত্মীয়-স্বজন সবাই নন্দিনীকে চেনে—আমার সঙ্গে তার কী সম্পর্ক তা সবাই জানে। তাছাড়া দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দিরে দাঁড়িয়ে হাতে হাত রেখে শপথ গ্রহণ করেছি—আমরা এক সাথে চলবো—কেউ কাউকে ত্যাগ করবো না। আমি কালী মন্দিরের সিঁদুর ওর মাথায় ছুঁইয়ে শপথ করেছি—বল এর পরেও নন্দিনী আমার সঙ্গে ফার্স করেছে।

বিমল ॥ তোর এ ব্যাপারে হয়তো ব্যতিক্রম হতে পারে। দেখ্—এসব বিষয় নিয়ে গবেষণা করার মত মনও আমার নেই আর ধৈর্যও নেই। তবে সত্য প্রেমের মূল্য আছে তা আমি স্বীকার করি। তবে এমন দৃষ্টান্তও দেখেছি, অনেক ছেলে আছে যারা সত্যি প্রেমিক—আদর্শবান। প্রেমিকা কথা দিয়েছিল যে সে আসবে। কিন্তু শেষে দেখা গেল মেয়েটি দিব্বি ফাঁকি দিয়ে শ্বশুর বাড়ী চলে গেল। আর ছেলেটা আজীবন ব্যর্থতার বোঝা বয়ে চললো। তবে সে আর ক'জন!

মৃত্যু ॥ নন্দিনীর যে শপথ তা কি মিথ্যে?

বিমল ॥ মিথ্যে এত বড় কথাটা বলি কি করে? মহান প্রেমে জয় আছে। তুই নিশ্চয়ই নন্দিনীর জন্যে অপেক্ষা করবি।

মৃত্যু ॥ আমাকে অপেক্ষা করতেই হবে। আমার যা দেবার তা নন্দিনীকে দিয়েছি। ওর জন্যে আমি আজীবন প্রতীক্ষা করে থাকবো। তুই বিশ্বাস কর বিমল, আমার মধ্যে এতটুকু ভেজাল নেই। আমি ওর জন্যে—

বিমল ॥ 'ডোণ্ট-বি-সিলি মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড। তোদের মধ্যে যে এতখানি গভীর যোগাযোগ হয়েছে তা তো আগে জানতাম না। জানলে একটু চেষ্টা করতাম। তবে বন্ধু হিসেবে ভগবানের কাছে এই কামনাই করবো—তোদের শপথ যেন মিথ্যে না হয়। তোর অপেক্ষা যেন সার্থক হয়। চল্—দেরী করে কোন লাভ নেই। পরে আবার শুনবো।

(বিমল, মৃত্যু—রাজাজীর পাওনা চুকিয়ে দিয়ে উঠে পড়ে। এই সময়ে ১নং রিজার্ভ সীট থেকে নন্দিনী ও আর একটি সুন্দর ছেলে ভাল পোষাকে বেরিয়ে আসে। দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়—ছেলেটি ধনী ঘরের। দু'জনের মুখেই হাসি। নন্দিনী'র হাসিটা একটু জোরালো। মৃত্যু, বিমল ঐ দিকে তাকায়। মৃত্যুর অবাক প্রশ্ন—)

মৃত্যু ॥ নন্দিনী না?

বিমল ॥ তাইতো মনে হয়।

মৃত্যু ॥ ছেলেটা কে? চিনিস্ নাকি?

বিমল ॥ [গম্ভীর হয়ে] চিনি—এ পাড়ায় এর নাম ডাক বেশ আছে: কোন এক ধনী-ব্যবসায়ীর সবে ধন নীলমণি। যা করে তাতেই মানায়—নামজাদা 'প্রফেশ্যান্যাল লাভার'।
[ক্যাশ কাউণ্টে গিয়ে সুন্দর ছেলেটা বিল মেটায়]

মৃত্যু ॥ নন্দিনী—ন-ন্দি-নী শেষে—আশ্চর্য! না হতে পারে না—ও আমায় কথা দিয়েছে—আমি এই মুহূর্তে ওকে একটা কথা জিজ্ঞাস করবো। [মৃত্যু নন্দিনীর দিকে এগিয়ে যায়। বিমল মৃত্যুকে বাধা দেয়।]

বিমল ॥ না।

মৃত্যু ॥ শুধু একটা কথা—এই কি আমাদের শপথ।

বিমল ॥ [কাঁধে হাত রেখে] না মৃত্যু। আজ আর তোর কথা নয়। তোর যা বলার তা শেষ হয়ে গেছে। [নন্দিনীরা হাত ধরা ধরি করে বেরিয়ে গেল]

মৃত্যু ॥ এখন দেখতে পাচ্ছি কৃষ্ণই ঠিক।

বিমল ॥ [বেদনার হাসি আর শুকনো সান্ত্বনা যোগায়] না। কৃষ্ণ কৃষ্ণ'র জগতে ঠিক। নন্দিনী নন্দিনীর জগতে ঠিক। আমরা আমাদের জগতে। তুই বেঁচে প্রমাণ কর—প্রকৃত প্রেমের মূল্য আছে। পাইকারী বাজারের দাঁড়ি পাল্লায় যে প্রেম ওজন করা যায় না—তেমন প্রেমের দৃষ্টান্ত দেখা। চল্ এদিক দিয়ে—

[বাঁ দিক দিয়ে মৃত্যু, বিমল এক সাথে বেরিয়ে পড়ে। সাথে সাথে মঞ্চ অন্ধকার হ'ল। এরই ফাঁকে পর্দা পড়ে গেল।]

৪

॥ মাস পয়লা ॥

॥ মাস পয়লা ॥

॥ চরিত্র ॥

মধু, রাজেন, রতন, রজত, ছেদি,
পথচারীগণ।

[সন্ধ্যা হব হব।
একটা ভাঙা বাড়ীর বড় দালান ঘর।
এটি পকেটমারী দলের একটা অস্থায়ী আস্তানা।
রাজেন চৌধুরী বিপর্যস্ত সাজে এক পাশে শুয়ে রয়েছে।
মধুদা কি যেন ভাবতে ভাবতে ঘরে ঢুকলো। বিড়ি ধরালো।
রাজেন বাবুর হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল।
রাজেনবাবু বিছানাপত্তর গুছাতে থাকে।
মধু বিড়ির পোড়া অংশটুকু ফেলে দেয়।
রাজেন তা কুড়িয়ে নিয়ে টান দিতে যায় এমন সময়—]

মধু ॥ ওটা ফেলে দাও।

রাজেন ॥ ফেলে দেব !

মধু ॥ হ্যাঁ ! [নতুন বিড়ি পকেট থেকে দেয়] এই নাও।

রাজেন ॥ [বিড়ি নিয়ে টান দিতে থাকে। পেরিয়ে আসা জীবনের একটা মুহূর্ত চোখের সামনে ভেসে উঠলো]
ইওর অনার ! ঝুড়ি ঝুড়ি প্রমাণ উপস্থিত করার পরেও আপনারা বলবেন যে আমার ছেলে অপরাধী ? কিন্তু কেন ? সত্যের মাপকাঠি দিয়ে যদি বিচার করা যায় তবে

ধর্মাবতার আমি বলবো—আমার ছেলে অপরাধী নয়। আর যদিই বা অপরাধী হয় তবে একমাত্র খুনের অপরাধে তার প্রাণদণ্ড। অসম্ভব! ইম্‌পসিবিল্‌।

মধু ॥ আবার বক্‌ বক্‌ করছে। যাও—

রাজেন ॥ [নিজেকে সংযত করে] মক্কেল এলে—

মধু ॥ বসতে বলবো। যাও [রাজেন চলে যায়] যতঃ সব।— এভাবে কতদিন চলে! তিনদিন একটা পয়সাও রোজগার হ'ল না। না, পকেটমারীতে আর সুবিধা হচ্ছে না! এবারে একটা বড় রকমের কিছু বাগাতে না পারলে চলছে না। [রতনের প্রবেশ। কপালে রক্তের দাগ] কিরে, এত সকাল সকাল ফিরলি যে? ওকি, কপালে রক্ত কেন?

রতন ॥ ধরা পড়েছিলুম।

মধু ॥ কোথায়? কেমন করে?

রতন ॥ বার নম্বর ট্রামে যখন ডিউটি দিচ্ছিলুম তখন—

মধু ॥ [ব্যস্তভাবে] তখন?

রতন ॥ সেকেণ্ড ক্লাসে উঠেছিলুম। গাড়ীতে ভিড় তেমন ছিল না। ব্লেড চালিয়ে ব্যাগটা কোন রকমে হাতের মধ্যে নিয়ে এলুম, তারপর—

মধু ॥ তারপর?

রতন ॥ তারপর হাতে নাতে ধরা, আর পরমুহূর্তেই পাব্‌লিকের শুল্কহীন বিক্ষিপ্ত চপেটাঘাত!

মধু ॥ তেমন লাগেনি তো?

রতন ॥ তেমন নয়—তবে বেশ খানিকটা, হাড়-পাঁজরাগুলো যা ভাঙ্গতে বাকী। ভাবচি আমার দ্বারা এ কাজ হবে না।

মধু ॥ তবে কার দ্বারা হবে? যাদের টাকা পয়সা আছে, যারা মোটা মাইনের চাকরী করে তাদের দ্বারা....[আচম্‌কা ভাবে রাজেনের পুনঃ প্রবেশ]।

রাজেন ॥ হ্যাঁ—really তাদের দ্বারা, যাদের আছে, যারা পাচ্ছে, তারাই আরো বেশী করে পেতে চায়। যারা পায় না তারা অল্প পেলেই খুশী।

...............ইওর অনার—আজ আমি যে কথা বলছি তা সম্পূর্ণ সত্য। এতে মিথ্যের এতটুকু রঙ্ নেই। আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, ধর্মাবতার আমার ছেলে মোটেই দোষী নয়—বিশ্বাস করুন ধর্মাবতার, এ ঘটনা সম্পূর্ণ সাজানো—খুন আমার ছেলে করেনি—বিশ্বাস করুন, আসামীর কাঠগড়ায় আমার ছেলে দাঁড়িয়ে আছে বলে আমি যে তার প্রতি এতটুকু পক্ষপাতিত্ব করছি তা নয়! আমি সর্বযুগ—সর্বকাল সর্বপোরি সর্বদেশের একটা সত্যকে উদ্‌ঘাটন করার চেষ্টা করছি। [কিছুটা দম নিয়ে] ছকে বাঁধা লিখিত আইনের কাছে আমার ছেলে দোষী আমি স্বীকার করি। কিন্তু সত্য ও ন্যায়ের দরবারে আমার ছেলে অপরাধী নয়। এত কিছু বলার পর আশা করি আমার বক্তব্য বিষয় আপনারা সকলে বিচার করবেন।

রতন ॥ [রসিকতা করে] Order ! Order !

রাজেন ॥ [নিজের মধ্যে নিজেকে ফিরে পায়] দু' একটা পয়সা দাও তো ?

মধু ॥ পয়সা কি হবে ?

রাজেন ॥ পয়সার কি হবে! তাইতো। পয়সায় কী না হয় ? পয়সাইতো সব। পয়সার জন্যেই তো এ বাড়ীটা মেরামত করতে পারছি না। পয়সার জন্যেই তো আপীল করতে পারলাম না! পয়সার জন্যেই তো—পয়সার জন্যেই তো—যাক্ ওসব ছেদো কথা। পয়সা দেবে কি না বল ?

মধু ॥ পয়সা নেই।

রাজেন ॥ নেই! পয়সা নেই ?

মধু ॥ না।

রাজেন ॥ ঠিক আছে। রাজেন চৌধুরী কি করে পয়সা রোজগার করতে হয় তা জানে [যেতে গিয়ে থেমে যায়।] কি হ'ল তোমার কপালে রক্ত কেন ?

মধু ॥ মার খেয়েছে।

রাজেন ॥ মার খেয়েছে! কে মারলো ?

মধু ॥ পাবলিক—মানে রাস্তার লোকেরা।

রাজেন ॥ জানি ওরা মারবে। ওরা শুধু মারতেই আসে। ওরা মারে—মেরে পালায়। মার খায় না। হতভাগার দল! যাক্‌গে! আমি চলি—হ্যাঁ কোন মক্কেল এলে বসতে বলো।

রতন ॥ হ্যাঁ,—হ্যাঁ, আপনি যান। মক্কেল এলে বসতে বলবো। বলবো উকিলবাবু জরুরী কাজে বেরিয়েছেন, এক্ষণি এসে পড়বেন।

রাজেন ॥ Thank you ! Thank you ! [প্রস্থান]

মধু ॥ পাগলটাকে এবার তাড়াতে হচ্ছে।

রতন ॥ কেন ? ও আবার কি করলো ?

মধু ॥ থেকে থেকে এক এক সময় এমন করে—

রতন ॥ তুমি তাড়ালে কি হবে। ও তো এটাকে নিজের বাড়ী বলে মনে করে।

মধু ॥ তা-যা বলেছিস। লোকটার ওপর বড্ড মায়া হয়। এক এক সময় রেগেও যাই। কিন্তু কপাল গুণে গোপাল জোটে! যেমন তুই। কোনও কাজটাই সাক্‌সেসফুলি করতে পারিস না। আজ মাস পয়লা। একেবারে প্রথম খেপেই ধরা পড়লি ?

রতন ॥ শুধু ধরা পড়লে তো বাঁচা যেত। তার ওপরে আড়ও ধোলাই, সেটা যাবে কোথা ?

মধু ॥ [রক্ত পরিষ্কার করতে করতে] একটু বুঝে শুনে কাজকর্ম করবি তো। যত সব আজে বাজে চিন্তা নিয়ে কাজকর্ম

করলে এইসব risk-এর কাজ করা যায় না। জানিস পকেটমারাটাও একটা art তার ওপর সাধনাও বটে। কাজেই মনোযোগ দিয়ে কাজকর্ম কর। ট্যাঁকতো গড়ের মাঠ। তুই বরং ৯ নম্বর ডাউন বাসে ডিউটি দে। ডালহৌসী থেকে চড়বি। আজ মাইনের দিন। বাবুরা মোটা মোটা তোড়া নিয়ে বাড়ী ফিরছে কাজেই বুঝেসুঝে—

রতন ॥ না মধুদা! আমি আর পকেট মারবো না।

মধু ॥ এই দেখ ভাল ছেলের কথা। একদিন মারধোর খেয়ে ভয় পেয়ে গেলি? যা-যা—সবে তো সন্ধ্যে।

রতন ॥ যে কাজে মন চায় না, সে কাজ না করাই ভাল, তাই........

মধু ॥ বেশতো, করিস না। মন যে কাজে নেই সে কাজ করিস না। কিন্তু কাজে মন না দিলে মন লাগবে কি করে?

রতন ॥ তা-বলে এই সব আজে বাজে—নোংরা—

মধু ॥ আজে বাজে! নোংরা! তুই আমায় হাসালি রত্না। আরে আমরা যে সমস্ত আজে বাজে নোংরা কাজ করি তার চেয়ে বহুৎ আচ্ছা আচ্ছা লোকেরা আরো মারাত্মক নোংরা—মারাত্মক আজে বাজে কাজ করে থাকে' তবে আমরা সামনাসামনি, তারা একটু ভেতরে ভেতরে—এই যা তফাৎ। এইসব আজে বাজে কথা কখনও ভাবিস্ না। কাজ করে চল—কাজেই মানুষ বড় হয়।

রতন ॥ না মধুদা—এত ছোট কাজে আর—

মধু ॥ করবি না, তাইতো? তাওতো বললাম একটা বড় কাজ কর। বাবু আবার বলে কি না ছেনতাই করলে সম্মান হানি হবে! চোর পকেটমারের আবার সম্মান কিসের রে? যা-যা কাজে যা। কি হ'ল, হাঁ করে মুখের দিকে তাকিয়ে আছিস যে। ও! আজও বোধ হয় পেটে কিছু পড়েনি? এক কাজ কর। রাস্তার চাপা কল থেকে খানিকটা গঙ্গাজল খেয়ে কাজে যা। তাতে পেটও ভরবে— পুণ্যিও হবে।

রতন ॥ আবার যদি মারধোর দেয়—

মধু ॥ মারধোর দেয় খাবি। ভয় নেই তোকে তো আর কেউ মেরে ফেলছেনা। আজ আমার কিছু টাকা চাই। বাড়ীতে মানি-অর্ডার করতেই হবে।

রতন ॥ মাফ কর মধুদা—

মধু ॥ [গম্ভীর স্বরে] র—ত—ন !

রতন ॥ চোখ রাঙ্গালে কি হবে ? সামান্য একটা জিনিসের জন্যে নানা জাতের লোকের হাতে মার খেতে হয়। হাজার জন দেখে টিট্‌কিরি দেয়। এতে লজ্জা হয় না বুঝি !

মধু ॥ লজ্জা ! বেঁচে আছিস কেন ? বাঁচার জন্যেই তো যত সব নোংরামী। কাজ নেই—সুযোগ নেই, আছে শুধু সমস্যা। আর এই সমস্যার সমাধানের জন্যে চাই টাকা। টাকা ! কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। এরপর তুই যদি আমার সামনে দাঁড়িয়ে এই সব সুবুদ্ধির কথা বলবি তবে আমি তোর জিভ উপড়ে ফেলবো। যা কাজে যা। বাসে আবার ভিড় কমে যাবে।

রতন ॥ [যেতে গিয়ে] মধুদা একটা কথা বলবো ?

মধু ॥ কি কথা ?

রতন ॥ সাতটা টাকা দিতে পার ?

মধু ॥ টাকা ! অত টাকা ! কেন ? এখানে কি তোর বাপের জমিদারী আছে ?

রতন ॥ মধুদা।

মধু ॥ হ্যাঁ—ঠিকই বলছি। একশোবার বলবো। এখানে কি তোর বাপ স্বর্গে যাবার সময় টাকার ট্যাকসাল খুলে গিয়েছিল ?

রতন ॥ তুমি আজ আমায় সবচেয়ে দুঃখ দিলে মধুদা।

মধুদা ॥ দুঃখু ! কেন দুঃখু ! দুঃখু পেলে জীবন চলে না। তোর টাকা চাই না ? টাকা কোথায় পাবি ? ভিক্ষে করতে গেলে লোকে বলে এত বড় মস্তানের মত চেহারা খেটে

খেতে পার না। ফুটে জুতো পালিশ করতে বসলে জায়গা পাওয়া যায় না। মোট বইতে গেলে ঘুষ দিতে হয়। পুরুষ হয়ে জন্মেছিলি কেন? মেয়ে হয়ে জন্মালেতো বেশ্যা-বৃত্তি করেও টাকা জোগাড় করতে পারতিস।

রতন ॥ [বিনয়ের সুরে] সাতটা টাকা না হলে মায়ের ওষধ কেনা হবে না। এই যে ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রিপসন্ [প্রেসক্রিপসন্ দেখায়, বিরক্ত হয়ে মধুদা তা ফেলে দেয়]

মধু ॥ ধ্যাৎ তোর প্রেসক্রিপসন্। কি দরকার মায়ের ওষুধের? মেরে ফেলতে পারিস না। খানিকটা বিষ এনে দে, সেটুকু খেয়ে মরুক।

রতন ॥ মধুদা!

মধু ॥ যে ছেলের দু' দুটো হাত পা থাকতে নিজের একটা মাকে খাওয়াতে পারে না সে ছেলের বেঁচে লাভ কি?

রতন ॥ মধুদা!

মধু ॥ [অপ্রকৃতিস্থভাবে] বেরো, বেরিয়ে যা। [ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেয়। রতন কিছু পরে আস্তে আস্তে উঠে পড়ে; তারপর পথের দিকে যেতে চায় এমন সময় মধু নিজেকে সামলে নিয়ে] এই শোন্ [হাতের একটা আংটি খুলে দেয়] এই নে বাজারে বন্ধক রেখে কিংবা বিক্রি করে মায়ের ওষুধ কিনে নিয়ে যা।

রতন ॥ [নিরুত্তর]

মধু ॥ [কাছে গিয়ে আংটিটা রতনের হাতে দেয়।] যে বলছি, জানিস্—এই আংটিটা—হ্যাঁরে এই আংটিটা আমার মা আমায় দুটো একটা পয়সা জমিয়ে কিনে দিয়েছিল যখন আমি ম্যাট্রিক পাশ করি। এখন এটা দিয়ে তোর মায়ের কিছুটা কাজে লাগবে। তোর মা, আমার মা—ও জগতের সবাইকার মা, যা—।

[রতন চলে যাবে এমন সময় ছেদিলালের প্রবেশ।

রতনের মলিন অবস্থা দেখে ছেদি একটু অবাক হলো। রতন চলে গেল—ছেদি মধুর কাছে এসে বললো—]

ছেদি ॥ কিবে শালা মধুদা! মন্দিরে একা একা বসে কি করছিস্ মাইরি? অফিসে যাবি না?

মধু ॥ অফিসে!

ছেদি ॥ আবে হ্যাঁ হ্যাঁ অফিসে। শালা সোটকাট কথাটা বুঝতে পারলে না? [হাত সাফাইয়ের নমুনা দেখায়] হাত সাফাই করতে।

মধু ॥ আজ তো আমার বেরুবার কথা নয়।

ছেদি ॥ মাইরি, তুমি শালা এতো কমরোজ কাজে যাও যে হামাদের কাজকর্ম করতে শালা মুডই আসে না। অথোচো ভাগের বেলায় তুমি শালা পুরো দোশ আনা লিবে—

মধু ॥ [রেগে] বাজে বকিস্ না। বেশী বকর বকর করলে এখুনি—

ছেদি ॥ তোমার মনটা হঠাৎ এতো গুসা হ'ল কেন বাপ? মহব্যতে পড়লে নাকি?

মধু ॥ ছেদি মুখ সামলে কথা বলবি।

ছেদি ॥ আই বাবা। তুমি আবার বড় বড় গোরম গোরম গোল গোল আঁখি দেখাচ্ছো কেন? দেখ এই সাঁজ সন্ধ্যা বেলায় ওসব ভাল লাগে না।

[হঠাৎ থেমে] দেখ মধুদা, শালা রতন টেরামে একটা ভদ্রলোকের পকেট থেকে একটা বেগ সাফ করছিল। ব্যস্ শালা সোঙ্গে সোঙ্গে ধরা পড়লো, আর শালা পাবলিকেরা এইসান ঠুসোর পর ঠুসো জমালো যে রত্না শালা একেবারে কাশ্মিরী পরোটা হয়ে গেলো, হা—হা—হা।

মধু ॥ তুই কি করছিলি?

ছেদি ॥ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিলুম।

মধু ॥ একজন মারখাবে আর তুই—তুই মজা দেখবি? তুই গিয়ে কোথা—

ছেদি ॥ রামবলো, হামি ছাড়াতে গেলে হামায় ভি সোন্দেহ করে। তারপর ঠুসোর পর ঠুসো জমিয়ে একেবারে দইবড়া করিয়ে ছাড়ুক আর কি। সেটি হোবে না গুরু।

মধু ॥ দেখ ছেদি—

ছেদি ॥ চেপে বসো শালা। তুমি শালা মেট্রিক পাশ করে একেবারে বুদ্ধু বোনে গেছো। তুমি শালা একটা সামান্য কথা বুঝতে পার না। আবে বাবা যাদের দোয়ায় হামরা বেঁচে আছি তারা হামাদের দু'চার ঠুসো দিলে সেটুকু হামাদের সোহ্য করা উচিৎ—আবে তোমাদের বাংলায় একটা কি কথা আছে না। ঐ যে—হ্যাঁ, যে শালা গোরু দুধ দেয় তার লাথিটাভি মিষ্টি লাগে।

মধু ॥ যদি মরে যায়—

ছেদি ॥ থোঃ,—তুমি শালা হামায় হাসিয়ে দিলে—হা—হা—হা। আবে হামাদের মতন পকেটমারের জাত কখোনো মোরে না—মোরতেভি পারে না। এই দেখো না, সেবারে বালীগঞ্জের বাসে সেই বুড়োটার পকেট থেকে একটা পেন গেঁড়া করতে গিয়ে শালা ধরা পড়লুম। আর সঙ্গে সঙ্গে শালা পাবলিকেরা এইসান ঠুসো দিলো যে হামি একেবাবে ওজ্ঞান হয়ে পড়লুম। লেকিন দেখলে তো, শালা সাতদিনের মধ্যে মায়ের ছেলে সিধে হাসপাতাল থেকে ঘরে চলে এলুম। থাক্ গুরু ওসব কথা। এখন একটা আসোল কথা বলবো।

মধু ॥ কি কথা?

ছেদি ॥ বলবো?

মধু ॥ বল।

ছেদি ॥ বলি?

মধু ॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ বল না।

ছেদি ॥ একটু মাল খিলাও না।

মধু ॥ কি বল্লি ? মাল খাবি ? ট্যাঁকে পয়সা আছে ?

ছেদি ॥ না।

মধু ॥ তবে মাল খাবি কেন ? এ সপ্তাহে কত রোজগার করেছিলি হিসেব দে।

ছেদি ॥ আই বাবা ! ও হিসেব-টিসেব হামার কাছে পাবে না। I. Com. পাশ করতে পারলে হিসেব দিতুম। সে তো পারিনি—তবে হ্যাঁ একটা কাজ করেছি। ইক্সপিরিয়েন্স গেদার করেছি—চার চার বার ফেল করেছি—হা-হা-হা।

মধু ॥ [হেসে ফেলে] বটে !

ছেদি ॥ আরে শালা তুমিই বলো না, হামাদের মত দু'চার জন যদি ফেল না করে তবে ইউনিভারসিটি চলবে কি করে।

মধু ॥ তা যা বলেছিস।

ছেদি ॥ হামাদের দেশের ছেলেরা লিখাপড়া শিখে খেতে পায় না। দেশের শিক্ষা বেবস্থা যতসব আজে বাজে জিনিস শিখিয়ে ছেলেগুলোকে একেবারে গাধা বানিয়ে ছেড়েছে—হামার মনে হয় গুরু, বোনের পশুগুলো বোধহয় হামাদের চেয়ে সুখী। যাক্ গুরু ওসব কথা। বেশি বললে শিক্ষিত লোকেরা আবার বলবে যে শালা বড্ড বড় বড় কথা বলছে। তা গুরু তুমি তো মাল খিলাবার এথি ছোড়লে না—হামি একবার বোরং হাওড়া ইষ্টিশানের দিকে একটু চক্কোর দিয়ে আসি। দেখি কিছু সোটকাতে পারি কি না।

মধু ॥ একটু দেখে শুনে—

ছেদি ॥ তুমি শালা কুচ্ছু ভেবো না—

[যেতে গিয়ে থেমে যায়]

মধু ॥ কি রে আবার থামলি কেন ?

ছেদি ॥ একটা কথা বলি গুরু।

মধু ॥ কি বল।

ছেদি ॥ না গুরু।

মধু॥ আঃ! বল না।

ছেদি॥ তুমি শালা রাগ করবে।

মধু॥ নারে, বল না।

ছেদি॥ তুমি শালা হামার হার্ট ছুঁয়ে বলো।

[ছেদি মধুর ডান হাতটা নিজের বুকে টেনে নেয়]

মধু॥ আচ্ছা ভাই হ'ল।

ছেদি॥ তোমার পোষ্টটা মাইরি হামায় দিয়ে দাও।

মধু॥ [হেসে] কেন?

ছেদি॥ তোমার মনটা বড্ড সাদাসিদে—মানে বড্ড নোরম মাইণ্ডের; এই বেইমানের কামকাজ শালা তোমার দ্বারা হোবে না।

মধু॥ এটেনসন্ [ছেদি কথা বন্ধ করে সোজা হয়ে নিশ্চুপভাবে দাঁড়িয়ে পড়ে] এবাউটট্রান [পেছনে ঘোরে] কুইকমার্চ [ছেদি চলতে থাকে] কুইক মার্চ লেফট্ রাইট-হল্ট্ [ছেদি থামে] একটু বুঝে শুনে।

ছেদি॥ সে তোমাকে ভাবতে হোবে না। হামি বোরং—বোরং—রোতন কোথা গুরু।

মধু॥ বোধ হয় বাড়ীতে।

ছেদি॥ ঠিক আছে—হামি বোরং রোতনাকে লিয়ে একটু ট্রেনিং দিয়ে আসি।

মধু॥ ওকে কাজে নিয়ে যাসনি; ওর মনটা—

ছেদি॥ [মধুর কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে] চেপে বসো শালা; তোমায় কুচ্ছু ভাবতে হোবে না। [ছেদিলাল চলে যায়—মঞ্চের আলো কিছুক্ষণের জন্যে নিভে গেল। আলো জ্বালার পর দেখা গেল মধু টুলে বসে আছে। ছেদি বা রতন এখনো ফেরেনি। সেই চিন্তায় মধুর মন অস্থির।]

মধু॥ না! এদের একটাকেও নিয়ে কাজ হবে না। এত সময় হয়ে গেল,—এরা গেল কোথা। [বিড়ি ধরায়। পকেট থেকে একটা এম্‌প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের কার্ড বার করে।

কার্ডটার দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপের হাসি হাসে] এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের কার্ড! তিন মাস অন্তর অন্তর কতবার যে রিনিউ করলাম তা শুধু আমিই জানি। হায়রে স্বাধীন রাষ্ট্র, হায়রে তার শাসন ব্যবস্থা। সবাই বসে একই কথা— যদি রাজা হতাম, রাজ্য পেতাম, জগতটাকে দেখে নিতাম! ধ্যাৎ—কিছু হবে না। এরা শুধু নিজেদের চেনে— নিজেদের গাড়ী বাড়ীর দিকেই তাকায়। আর গরীবের কাছ থেকে খাবার কেড়ে তাদেরকে বিষ দেয়। এরা আবার আমাদের শাসন করে, বিচার করে, শাস্তি দেয়, আর ঐ স্বার্থান্বেষী মানুষগুলো যারা গাড়ির উপর বসে অসমাজ সৃষ্টি করে মানুষকে নোংরামীর মধ্যে টেনে নিয়ে আসে, তাদের বিচার করবে কে? কেউ না। কারণ তাদের বিচার করার আগেই তারা বিচারকের গদিতে বসে আছে। [কথা শেষ না হতেই অস্থিরভাবে রতন প্রবেশ করে, হাতে তার একটা ব্যাগ।] কি রে, কি ব্যাপার, হাঁপাচ্ছিস কেন?

রতন॥ পরে বলছি।

মধু॥ ছেদি কোথায়?

রতন॥ এই ব্যাগটা সাফ্ করে আমার হাত দিয়ে সরিয়ে দিল।

মধু॥ তারপর।

রতন আমি লুকিয়ে নিয়ে চলে এসেছি। ওরা আমার পিছু নিয়েছে।

মধু॥ ছেদি ধরা পড়েনি তো।

রতন হ্যাঁ ধরা পড়েছে। লোকেরা মারতে মারতে ওকে নিয়ে গেল।

মধু॥ এখন উপায়!

রতন॥ একটা কথা বলবো?

মধু॥ তাড়াতাড়ি বল।

রতন॥ চল আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই—এই নোংরা পরিবেশে না থেকে—

মধু॥ [তেড়ে আসে] ফের তুই জ্ঞান দিচ্ছিস্।

রতন ॥ আমি যখনই একটা কথা বলি তখনই তুমি তেড়ে ওঠো।

মধু ॥ একজন জেলে যাচ্ছে আর একজন জ্ঞান দিচ্ছে—যা পালা এখান থেকে। তোকে আর দলে থাকতে হবে না, আমি একাই চালাবো।

রতন ॥ তুমি শুধু শুধু আমার ওপর রাগ করছো।

মধু ॥ তবে কি তোমায় পূজো করবো—বলি কোথায় যাবো ?

রতন ॥ কেন তোমার ঘরে, তোমারও তো ছেলে-বৌ আছে ; ভাই, মা, বাবা সবাই আছে, তাদের কাছে যাও।

মধু ॥ টাকা, টাকা জোগাবে কে ? ভাগ্ পালা এখান থেকে—

[নেপথ্যে কয়েকজনের কণ্ঠ শোনা গেলো। ১ম জন বললো—এদিকে গেছে বলে মনে হ'ল। ২য় জন—"দাদা এদিকে একটা ঘর দেখতে পাচ্ছি"—

১ম ॥ "তাই নাকি ?"

৩য় ॥ "ঢুইকা পড়েন।" [তিনজন পথচারী সমেত আরো কয়েকজন হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ে। রতন পালিয়ে যায়। কিন্তু মধু ব্যাগ নিয়ে পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে; তার পর পাইকারী রেটে আড়ং ধোলাই শুরু হয়।]

৩য় ॥ হালা বুদ্ধি কইরা কাম সারছে। ব্যাটা চুর।

মধু ॥ না দাদা, আমি চোর নই।

৩য় ॥ হ'—ব্যাটা সাধু। মার হালারে। [মারে]

মধু ॥ আঃ !

১ম ॥ মুখে পাঁচ সেরি একটা বসান দাদা। [পুনরায় ঘুঁসি মারে]

মধু ॥ আঃ !

২য় ॥ আ কিরে ! [পেটে মারে]

মধু ॥ উঃ ! [সহসা রজত প্রবেশ করে]

রজত ॥ কি দাদা পেয়েছেন ?

৩য় ॥ পামুনা ক'ন কি ?

২য় ॥ আমরা পাবনা, বলেন কি মশাই।

রজত ॥ আমার ব্যাগটা ?

৩য় ॥ এই লন, ভাল কইরা দেখেন। [রজত ব্যাগ দেখতে থাকে]

রজত ॥ এই দামী জিনিসপত্তর হারালে সর্বনাশ হ'ত। না, সব ঠিকই আছে।

১ম ॥ এবারে বড়দার চাঁদ মুখটি একবার দেখুন। শালা যেন ফুলশয্যে ঘরের কনেটি। দেখুন দেখুন—চাঁদমুখটি দেখুন। [চুল ধরে কাছে টেনে আনে। রজত মধুকে দেখে অবাক হয়ে যায়।]

রজত ॥ দাদা। একি !

২য় ॥ একি, দাদা !

১ম ॥ একি আপন দাদা ভাই ?

২য় ॥ না দাদা—মাসতুতু ভাই—চোরে চোরে····এবারে কেটে পড়ুন, তা না হলে বিপদ—[সবাই আস্তে আস্তে সরে পড়লো। রজত শুধু দাঁড়িয়ে থাকে। ইতিমধ্যে রাজেন ঢোকে।]

রাজেন ॥ একি ! বাড়ীতে এত লোক কেন ? What a dramatic situation ! Who are you ? এরা কি বোবা নাকি ! [রজতের প্রতি] এই আধমরা ব্যক্তিটী তোমার কে ?

রজত ॥ আমার ভাই।

রাজেন ॥ ভাই ! মানে আপন ভাই ? তুমি পকেটমারের ভাই ! বেশ ভাই। [আস্তে আস্তে রাজেন Stage-এর ডান দিকে এগিয়ে যায়] পকেট মারের ভাই ! একজন ভদ্রলোক—সে পকেট মারের—Your honour. এ যে পকেট মারে, এর জন্যে কি এ দায়ী ? একজন ভদ্রলোকের ছেলে অনেক দূর্বিপাকে পড়ে তবে সে এ লাইনে নেমেছে—এ Inborn পকেটমার নয়—ধর্মাবতার বিচার চাই—আমি জানতে চাই এই অপরাধের প্রকৃত আসামী কে ? [রজতের প্রতি] You, [মধুর প্রতি] You ! Then [নিজের প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করে] No-no—then where is

আসামী? Where is the actual criminal? [মৃদু হেসে] নেই! আসামী নেই—পালিয়েছে—আসামী—পলিয়েছে—আসামী নেই, কি নেই! কেন নেই! মানে নেই—খোকা নেই, আমার খোকা নেই—খো—কা!
[আবেগে রাজেন বেরিয়ে যায়।]

রজত ॥ দাদা, তুমি এখানে!

মধু ॥ তুই এখানে!

রজত ॥ আমি যে কথা বলছি তুমি তার উত্তর দাও। তুমি এখানে।

মধু ॥ হাঁ আমি এখানে—এখানেই আমি থাকি, এখানেই আমার ঘর।

রজত ॥ থাক আর বলতে হবে না। আজকে বুঝলাম কেন তুমি চিঠিতে ঠিকানা দাও না। ঠিকানা লিখলে পাছে কেলেং-কারি ঘটে সেই জন্য—ছিঃ ছিঃ! দাদা, তুমি আমাদের বংশের মানসম্মান সবকিছু নষ্ট করলে! তোমার চুরি করা পকেটমারি পয়সা দিয়ে আমরা খেয়ে বাঁচি! লেখা-পড়া শিখি! ছিঃ ছিঃ—তুমি শেষকালে মিথ্যে কথা—

মধু ॥ রজত! বইয়ে পড়া সত্যমিথ্যের ধারণা দিয়ে তুমি তোমার দাদাকে বিচার করতে এসোনা।

রজত ॥ আচ্ছা দাদা, কী দরকার ছিল এইসব নোংরা কাজ করে টাকাপয়সা রোজগাবের!

মধু ॥ টাকাপয়সা না হলে খেতিস কি? লেখাপড়া শিখতিস কি করে?

রজত ॥ তা বলে মিথ্যেকে আশ্রয় করে?

মধু ॥ মিথ্যে! সত্য বলে আমরা যাকে জানি, যখন আমরা তাকে আশ্রয় করতে পারি না তখন মিথ্যেকে কেন সত্য বলে মেনে নেব না?

রজত ॥ তা হলে ভগবানের কাছে যে ক্ষমা পাব না।

মধু ॥ ভগবানের বিচার ভগবান করবেন, তাঁর বিচারের কথা আমরা ভাববো কেন?

রজত ॥ ভাবছি তুমি এত অধঃপাতে নামলে কি করে? আমাদের বংশের মান, ঐতিহ্য সব নষ্ট হয়ে গেল!

মধু ॥ আমার কলেজে পড়া ভাই আজ আমায় শিক্ষা দিতে এসেছে! মান! সম্মান! ঐতিহ্য! দুঃখ হয়—তোরা নতুন কিছু বলতে পারলি না।

রজত ॥ এরপর সবাই যখন জানতে পারবে তখন লোকের কাছে মুখ দেখাবো কি করে?

মধু ॥ ভয় নেই! আমি তোদের পথ থেকে সরে দাঁড়াবো, আমার নোংরামিতে তোদের জীবনে কলঙ্ক আনবো না। তোরা তোদের বংশ—মান—সম্মান—সমাজ নিয়ে বেঁচে থাক! আমি যে পকেটমার। [মধু যেতে চায়, রজত বাধা দেয়।]

রজত ॥ কোথায় যাচ্ছ?

মধু ॥ জানি না।

রজত ॥ তবুও—

মধু ॥ যদি বলি—মরতে?

রজত ॥ দাদা!

মধু ॥ হ্যাঁ, সেইটাই আমার একমাত্র পথ। তোদের সমাজে ঐতিহ্য আছে, বংশমর্যাদা আছে, আমি না সরে গেলে তোরা মাথা তুলে দাঁড়াবি কি করে? [রজত হাত ধরে] হাত ছাড়!

রজত ॥ না। তুমি যেতে পারবে না।

মধু ॥ যেতে আমায় হবেই।

রজত ॥ যেতে তোমায় দেব না। দাদা, ভুল মানুষ করে, সে ভুল ও অন্যায়ের ক্ষমা আছে—চল, বাড়ী চল। অতীতকে ঘেঁটে লাভ নেই, চল আবার নতুন করে জীবন শুরু করবে।

মধু ॥ কেন, কিসের আশায়?

রজত ॥ বেঁচে থাকার আশায়।

মধু ॥ [মুগ্ধ দৃষ্টি রজতের মুখের দিকে প্রসারিত করে।] বেঁচে থাকার আশায়!

রজত ॥ হ্যাঁ, জীবনের মত জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার আশায়।

মধু ॥ না-রে, ওরে না, না—আমি পারবো না, আমি পরবো না। আমি হেরে যাবো—

[মধু ছেলেমানুষের মত কেঁদে ফেলে। রজতের কাছে এসে মধু রজতের বুকে মাথা রাখে। পর্দা ইতিমধ্যে নেমে আসে।]

৫

॥ স্বর্গ থেকে আস্‌ছি ॥

॥ স্বর্গ থেকে আস্‌ছি ॥

॥ পূর্বপাঠ ॥

কথা উঠতে পারে—এ নাটকের চরিত্রগুলো বস্তুতপক্ষে কে বা কারা? আর কেনইবা নারদ স্বর্গ থেকে হঠাৎ অসময়ে এসে ওপরের কীর্তিকলাপ ফাঁস করে গেল? অথবা—এ নাটকের মধ্যে কোন্ সত্যটা প্রতিফলিত করার চেষ্টা করা হয়েছে? বলতে বাধা নেই—এর সঠিক উত্তর দেবার সময় আজ আসেনি, আদৌ কোনদিন আসবে কিনা বলতে পারি না; তাছাড়া এমনও হতে পারে সঠিক উত্তর দেবার মত শক্তিসামর্থ আমার নেই।

তবে এটুকু বলতে পারি—নিদেন পক্ষে—একান্ত ব্যক্তিগত কোন মানুষের প্রতি কোন কটাক্ষ জ্ঞাতসারে আমি করিনি। আর এটুকুও বলতে পারি—এ নাটক কল্পনানির্ভর সত্য-মূলক! কল্পনার আবরণটুকু সরিয়ে নিলে যে সত্যটুকু পড়ে থাকে, সেটুকুই আমার নাটক। আসলে—স্বর্গ কিছুই নয়, আজকের যুগে রামরাজত্বই হচ্ছে স্বর্গ। নারদ সেই রাজত্বের প্রতিনিধি বিশেষ। রাম আমাদেরই মত খেটে খাওয়া সৎ মেহনতী মানুষেরই একজন। আর 'মা' হচ্ছেন ভারতবর্ষ।

—নাট্যকার

রবীন্দ্র ভারতী : নাটক বিভাগ
কলিকাতা-৭।

॥ স্বর্গ থেকে আসছি ॥

॥ চরিত্র ॥

নারদ ॥ মা ॥ রাম ॥

[রাম মর্ত্যবাসী। সারাবেলা খেটেখুটে এসে নিজের ঘরে বিশ্রাম করছে। জানলা দিয়ে পাশের ছোট্ট ঘরটা দেখা যাচ্ছে খানিকটা। রাত একটু বেশী।

রাম তক্তপোষে শুয়ে। তক্তার সামনে একটা ভাঙ্গা চেয়ার। কোন রকমে লোকদেখানো গোছের সাজানো। হ্যারিকেনের আলো অল্প জ্বলছে। দরজায় খিল আঁটা। গায়ে একটা হাতাকাটা গেঞ্জি। পরনে লুঙ্গি।

হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। রামের ঘুম ভেঙ্গে যায়। সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। বিছানা ছেড়ে এসে কপাট খুলে দেয়। রাম অবাক হয়ে যায়।

স্বর্গ থেকে দেবদূত নারদ এসেছেন। হাতে তাঁর সেই পুরোনো যন্ত্রটা। পরনে সিল্কের থান ধুতী এবং গায়ে একটা আধময়লা ফতুয়া। জটা-জুট-ধারী। কপালে বিরাট তিলক—যেন 'মর্ডান রিপ্রেজেন্টেশন'! রাম প্রথমে অন্ধকারে ঠিক মতন ঠাহর করতে পারে নি।]

রাম ॥ কে আপনি ?

নারদ ॥ নারায়ণ! নারায়ণ!

রাম ॥ যা বাব্বা! এত রাতে কে আপনি ?

নারদ ॥ [চোখ বোজা] নারায়ণ! নারায়ণ !!

রাম ॥ [ভাল করে লক্ষ্য করে] কি ব্যাপার, আপনি হঠাৎ ওপর থেকে নীচে যে!

নারদ ॥ নারায়ণ! নারায়ণ!

রাম ॥ সেরেছে! সারাবেলা খেটেখুটে এসে একটু বিশ্রাম করছি—তাতেও নিস্তার নেই!

নারদ ॥ নারায়ণ! নারায়ণ!

রাম ॥ বলি মশায়ের হ'ল কি? 'নারায়ণ' 'নারায়ণ' করে মরছেন কেন?

নারদ ॥ নারায়ণ! নারায়ণ!

রাম ॥ বলি—ও মশায়, আপনার ব্যাপারটা কি? আপনি কি জ্বালাবার আর সময় পেলেন না?

নারদ ॥ [চোখ খুলে] আমি এখন কোথায়?

রাম ॥ [বিরক্ত হয়ে] মর্তের শ্রীরামচন্দ্র মোদকের বাড়ীতে!

নারদ! ও, তবে তো ঠিক জায়গায় এসে পড়েছি।

রাম ॥ কেন, মশায় কি চেখের মাথা খেয়েছেন?

নারদ ॥ না, তা কেন,—রাতের অন্ধকারে ঠিক মত ঠাহর করতে পারি না—[নারদ ঘরে ঢুকে সাজানো ভাঙ্গা চেয়ারে বসতে গিয়ে পড়ে যায়।]

রাম ॥ আহা! করছেন কি? দেখবেন তো ওটা ভাঙ্গা—আ! কি—

নারদ ॥ [চিৎপাত হয়ে পড়ে গিয়ে বিকট চিৎকার করে ওঠে] উহু! হেঁ—আ! [কিছুক্ষণ পর একটু শান্ত হয়ে—মুখ বিকৃত করে] এ্যা! এই রকম ভাঙ্গা চেয়ার রেখেছেন?

রাম ॥ তবে কি রাখবো? আপনার জন্য কি স্বর্ণসিংহাসন আনবো নাকি?

নারদ ॥ [উঠে দাঁড়ায়] না না, আমি তা বলছি না; আমি বলছি—একটু সারিয়ে টারিয়ে রাখতে পারেন তো?

রাম ॥ খেটে খাওয়া মুটেমজুর মানুষ। শরীরের রোগ সারাতে পারি না, তার ওপর আবার চেয়ার সারাব! আপনার আর কি, ওপরে তো দিব্বি মজা মেরে বসে আছেন।

মাঝে মাঝে ওপরের কিছু নীচে, আর নীচের কিছু ওপরে—এভাবে পকেটবাজী করে বেশ সুখেই দিনকাল কাটাচ্ছেন। এখানকার হালচাল বুঝবেন কি?

নারদ ॥ সেকি! ওপরের বড়রা আপনাদের না বুঝলেও আমি নিতান্ত ছোট হয়েও আপনাদের মত মানুষকে অন্তত বোঝার চেষ্টা করি। এই দেখুন না, আপনাদের জন্যে মন কাঁদে বলেইতো কাজের ফাঁকে টুক্ করে আপনাদের সুখ-দুঃখের খবরাখবর নিতে ছুটে চলে এসেছি।

রাম ॥ [জোরে] বেশ করেছেন।

নারদ ॥ কি বললেন?

রাম ॥ বলছি বেশ করছেন। এসেছেন যেকালে একটু বিশ্রাম করুন, সব খবরাখবর জানুন, তারপর কেটে পড়ুন।

নারদ ॥ বটেইতো! আগে আপনার খবর বলুন।

রাম ॥ [বিরক্তভাব] ভালই।

নারদ ॥ আপনি মশাই রেগে যাচ্ছেন। আপনার বাড়ীতে এলাম, কোথায় আপনি তোয়াজ টোয়াজ করবেন, তা নয় কেমন বোদা আমড়ার মত টক্ টক্ ভাব দেখাচ্ছেন। এভাবে খেদিয়ে উঠলে তো—

রাম ॥ উপায় নেই।

নারদ ॥ মানে?

রাম ॥ তোয়াজ করবার আর দিন নেই। নিজেকেই সামলাতে পারি না—তার ওপর আবার দেবতা। না মশায়, আপনাদের ওপর আর আমাদের ভরসা নেই।

নারদ ॥ [অবাক হয়ে] সেকি কথা! [হেসে] এটা আপনি অভিমান করে বলছেন। আসলে আমাদের ওপর সকলেই ভরসা করে।

রাম ॥ বাজে কথা। আপনাদের নিয়ে আমরা এখন ব্লাফ্ দিই।

নারদ ॥ আপনারা মুখে যতই ও কথা বলুন না কেন, অন্তরে অন্তরে

আপনারা আমাদের না মেনে পারেন না। সবচেয়ে বড় কথা—আপনাদের সবকিছু আমরা ক্ষমার চোখে দেখি।

রাম ॥ [অসহ্য হয়ে] আপনি এখান থেকে বেরিয়ে যান।

নারদ ॥ সেকি কথা!

রাম ॥ দেবতার আড্ডা আমার ঘরে চলবে না।

নারদ ॥ [ভয় পেয়ে] কিন্তু আমি তো ঠিক দেবতা নই। তাঁরা তো ওপরে সুরা পান করে দিব্বি বিলাসব্যসনে দিন কাটাচ্ছেন। আর সেই অবকাশেই তো আমি আপনার কাছে ছুটে এলাম। [পকেট থেকে একটা বোতল বার করে]

রাম ॥ ও কি! ওটা কি বার করছেন?

নারদ ॥ [মুখে আঙ্গুল দিয়ে] চুপ! লোকে শুনতে পাবে—[কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি বলে] এ আপনাদের মর্তের দিশী জিনিস। সাতকড়ির পানের দোকান থেকে কিছু ব্ল্যাক মানি দিয়ে নিয়ে এলাম।

রাম ॥ এঁ্যা! আপনি মদ নিয়ে আমার ঘরে ঢুকেছেন। ছিঃ ছিঃ! দেবতাদের আজকাল হল কি? আপনি এখনি চলে যান।

নারদ ॥ এমন করছেন কেন?

রাম ॥ আপনি বোতলটা কি করবেন?

নারদ ॥ এর ভেতরেরটা খাবো আর এই খালি বোতলটা আপনাকে উপহার দেব—আপনার অনেক কাজে লাগবে।

রাম ॥ ও সব নেহি চলেগা!

নারদ ॥ [মুখটা পাংশুটে মেরে যায়] বেশ খাবো না। এই বোতল রেখে দিলাম।

রাম ॥ আপনাদের মধ্যে আজকাল তা হলে এই দশা হয়েছে? আচ্ছা মশায়, গরীবের ঘরে কেন এইগুলো নিয়ে আসেন। আপনাদের ওপরে কি এসব পাওয়া যায় না?

নারদ ॥ পাওয়া যায়—তবে আবার পাওয়াও যায় না। বলতে গেলে কি, যাওবা পাওয়া যায়—তাও আবার ভেজাল। আর যেগুলো খাঁটি আছে, তা আবার ওদের জন্য।

রাম ॥ ওদের জন্যে ?

নারদ ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। ঐ যে—ঐ ব্রহ্মা—মহাদেব—

রাম ॥ মহাদেব! তিনি তো মশাই সিদ্ধি-গাঁ্যাজা খান—

নারদ ॥ আজ্ঞে তিনি এখন মদও ধরেছেন। উপরে ক্রাইসিস্ বেশী কিনা। আগে যাও বা টেনেটুনে দু'এক বোতল সরাতে পারতুম, এখন আর তাও হয় না।

রাম ॥ কেন ?

নারদ ॥ এখন বড় কড়া আইন। তাইতো এখানে ছুটে আসতে হল। তাও দেখুন না, কাজ ফেলে চলে আসতে হয়েছে।

রাম ॥ এত রাতে কাজ! সেকি মশায়!

নারদ ॥ না! আপনার বুদ্ধি এখনো পাকেনি। শুনেছি—মর্তের মানুষরা নাকি বুদ্ধির দিক থেকে একালে খুব উন্নতি করেছে। আপনাকে দেখে কিন্তু তা মনে হচ্ছে না।

রাম ॥ দেখুন মশায়, জ্ঞান দেবেন না, মাষ্টারী করার অনেক জায়গা আছে। যা বলার চটপট্ খুলে—বেশ পরিষ্কার করে বলুন।

নারদ ॥ রাতেই ওখানে কাজ হয়। লোকদেখানে'র জন্যে কেবল দিনের বেলায় সখি-সখাদের নিয়ে একটা আসর-বাসর পাতা হয় আর কি।

রাম ॥ এর মানে কি ?

নারদ ॥ এর মানে আর কিছুই নয়। লোককে তো দেখাতে হবে—স্বর্গ-রাজত্বের অনেক উন্নতি হচ্ছে। সেই জন্যেই দিনের বেলায় ঐ রকম আয়োজন করা হয়।

রাম ॥ একটা কথা বলবো ?

নারদ ॥ বলুন।

রাম ॥ বড় সংকোচ হচ্ছে।

নারদ ॥ নারায়ণ! নারায়ণ! বিনা সংকোচেই আপনি বলুন।

রাম ॥ [ইতস্তত: করে] আমি বলছিলাম কি—মানে আপনি কিছু মনে করবেন না তো?

নারদ ॥ নারায়ণ! নারায়ণ! আরে আপনি বলুন। সবাইকার ভালমন্দ অনেক কথাই আমাদের শুনতে হয়। আমাদের কোন কিছুতে মনে করলে চলে না। সবাইকার মন রেখে চলাই হচ্ছে আমাদের কাজ।

রাম ॥ আপনার এই পোশাক পরিচ্ছদ—অর্থাৎ কেমন যেন এলো-মেলো—ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না।

নারদ ॥ [উচ্চ হাসি] ও:—হো-হো-হো! এই কথা! সিল্কের ধুতীটা হচ্ছে স্বর্গের নমুনা, আর ফতুয়াটা আপনাদের, মানে মর্ত্যের। যেখানকার যা সেখানে সেইরকম সাজসজ্জা না পরে এলে সকলে সব সময় চিনতে পারেন না। আপনাদের এখানে এলে পাছে আপনারা নাও চিনতে পারেন সেই জন্যেই এইরকম একটা সাজসজ্জার আশ্রয় নিতে হয়েছে। তা ছাড়া, পুরোটা দামী রাজবেশ পরে এলে সকলে সন্দেহ করে। অথচ আমি যে দেবতার মধ্যে একজন এবং আপনাদেরও একজন এটাও দেখাতে হবে। দুদিন পরে দেখবেন, আমরা হয়তো সাজসজ্জাই পরবো না।

রাম ॥ এঁ্যা! ছি: ছি: একি বলছেন। আপনারা স্বর্গের মহাজন! দেবতা বিশেষ! আপনাদের আবার অভাব কিসের। ভাল ভাল খাবেন, ভাল ভাল পরবেন—

নারদ ॥ [দু:খ প্রকাশ করে] আগে হ'লে হ'ত। এখন সে স্বর্গ আর নেই!

রাম ॥ কেন?

নারদ ॥ স্বর্গের ধরন-করন সব আস্তে আস্তে পাল্‌টে যাচ্ছে।

রাম ॥ সেকি মশায় !

নারদ ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। মর্ত্য থেকে যে সমস্ত পণ্ডিতলোকেরা ওখানে গিয়ে বসবাস করছে, তাতে আমাদের সুখশান্তির দফারফা হয়ে যাচ্ছে। দেখছেন না চেহারাটা কেমন শীর্ণকায় হয়ে পড়ছে।

রাম ॥ তা অবশ্য—। ছবিতে আগে আপনার চেহারা দেখেছিলাম বেশ নাদুশ নুদুশই ছিলেন।—কিন্তু এমন হল কেন ?

নারদ ॥ আরে মশাই সব ভাল ভাল বুদ্ধিমান লোকেরা ওখানে সুযোগ পাচ্ছে। ভাল ভাল খাবার না দিলে তারা বলে আন্দোলন করবো। তাই মা অন্নপূর্ণা সময় থকতে সব অন্ন ওদের হাতে তুলে দিয়েছেন। এখন মর শালা তোরা। তারপর দেখুন, এইটুকু এইটুকু পুচকে ছেলেরা ওপরে গিয়ে এমন কড়াইভাজার মত কট্‌কট্‌ করে ইংরেজি বলছে যে, আমরা ওপরে ঠেক খেতেই পারছি না। [দুঃখ প্রকাশ করে] না, আপনাদের—মানে মানুষদের জ্বালায় ওপরের রাজত্ব আর রাখা গেল না !

রাম ॥ কেন রাখা যাবে না। আপনারাও ভাল করে ইংরেজি শিখুন না কেন ?

নারদ ॥ সেকি আর কম চেষ্টা করছি। কিন্তু যত বেশী করে মুখস্থ করি ততই মন থেকে সব উড়ে যাচ্ছে।

রাম ॥ তা হলে তো আপনাদের রাজত্বের বারটা বেজে যাবে !

নারদ ॥ বেজে যাবে না, বেজে গেছে। [দুঃখে অভিভূত হয়ে] নেহাত পারমেনেন্ট তাই। তা না হলে ওখান থেকে আপনাদের কাছেই চলে আসতুম।

রাম ॥ অমন রাম-রাজত্ব ছেড়ে কে আসে বলুন।

নারদ ॥ আমি অন্ততঃ গ্যারান্টি দিতে পারি—তাছাড়া গরীবদের দুঃখ-কষ্ট আমি যেমন বুঝি আমাদের মধ্যে তেমন আর কেউ বোঝে না।

রাম ॥ চা খাবেন ?

নারদ ॥ চা! মন্দ কি।

রাম ॥ মা, মা—এককাপ চা দাও তো।

মা ॥ [নেপথ্যে] এত রাতে চা কি হবে রে ?

রাম ॥ স্বর্গ থেকে মানব দরদী দেবদূত নারদ স্বয়ং এসেছেন।

মা ॥ [নেপথ্যে] এখুনি দিচ্ছি বাবা।

রাম ॥ আচ্ছা, যারা ওপরে গিয়ে আপনাদের মানছে না তাদের মধ্যে কে কে আছে বলুন তো ?

নারদ ॥ কার কথা বলি বলুন, সবাই আছে। ঐ আপনাদের বিশ্ব-বিখ্যাত রবীন্দ্রনাথ, তিনি তো একেবারে ঘোর দেবতা বিরোধী।

রাম ॥ সে কি! রবীন্দ্রনাথ স্বর্গেও আপনাদের জ্বালাচ্ছেন ? মর্ত্যের তো বারটা বাজিয়ে রেখে তবে গেছেন।

নারদ ॥ আজ্ঞে তা যা বলেছেন। আমাদের সঙ্গে থেকে উনি আমাদেরই স্বীকার করতে চান না। দেখুন, ওনাকে কত করে বুঝিয়েছিলাম—বলেছিলাম—দেখুন রবিবাবু, মর্ত্যে কি ছাত্র, কি সাহিত্যিক, কি সমালোচক সবাইকেই তো জ্বালিয়ে এসেছেন। বয়েস তো যথেষ্ট হ'ল—এবারে আমাদেব নিয়ে একটু সুখেশান্তিতে থাকুন না কেন ?

রাম ॥ তা উনি কি বললেন ?

নারদ ॥ উনি হাসলেন। বললেন—তুমি আর আমি-র মধ্যে পার্থক্য কি ? আমিও যা তুমিও তাই। মানুষ মাত্রেই দেবতা। এই কথা বলেই নিজের লেখা বই থেকে খানিকটা কবিতা আওড়ে দিলেন—যার অর্থ আমি একবিন্দুও বুঝলাম না। আচ্ছা মশাই, এটা কখনো হয়। চুনের জল আর দুধ কি এক জিনিস! দেবতা আর মানুষ—এ কখনো এক হতে পারে ?

রাম ॥ কখনো নয়। তা আপনারা এবিষয়ে কোন প্রতিবাদ করছেন না কেন ?

নারদ ॥ [হতাশ হয়ে] তা কি আর করিনি। প্রতিবাদও করে ছিলাম। ব্রহ্মা বললেন—বেশী ফটরফটর করো না, যেমন আছ তেমনি থাক। বেশী চালাকী করতে গেলে রাজত্ব আবার মানুষের হয়ে যাবে। রাশিয়া আবার রকেট ছেড়েছে, ভারতবর্ষেও তৈরী হচ্ছে। মনে নেই, এইতো সেদিন গ্যাগারিন কানের পাশ দিয়ে হাত নাড়তে নাড়তে চলে গেল।

রাম ॥ [ব্যগ্র হয়ে] তারপর ?

নারদ ॥ তারপর আর কি ? এই কথা বলেই তিনি ধ্যানমগ্ন হলেন।

রাম ॥ হুঁ ! তা'অন্য কিছু action নেবার ব্যবস্থা করা উচিত।

নারদ ॥ তা ও করা হয়েছিল, কিন্তু টিকলো না।

রাম ॥ কি করেছিলেন ?

নারদ ॥ ক্ষণ জন্মাপুরুষ উদ্ধার আইন পাশ।

রাম ॥ সেটা আবার কি ?

নারদ ॥ বুঝলেন না ? মানে যাঁরা বুদ্ধিমান—প্রতিভাবান—তাদেরকে মর্ত্যে না রেখে অল্প বয়সেই স্বর্গে তুলে নেয়া হবে। আইন পাশ করার পর মর্ত্য থেকে দু'একজনকে ওপরে নিয়েও গিয়েছিলাম। কিন্তু সে এক সাংঘাতিক বিপদ ! মানুষরা বললেন—দেবতাদের সঙ্গে স্বর্গে বসবাস করা আমাদের পোষাচ্ছে না। মানুষদের সঙ্গে পুনরায় বসবাস করার জন্য তারা দেবাদিদেব মারফত ব্রহ্মার কাছে দরখাস্ত পাঠিয়েছেন। তাতে এই বলে তারা অভিযোগ করেছেন— আমাদের আয়ু থাকতে কেন স্বর্গে নিয়ে আসা হল ?

রাম ॥ আচ্ছা, ওখানে কি ভাল মানুষ যাচ্ছে না ?

নারদ ॥ যাচ্ছে, তবে টিকতে পারছে না। সবাইকার মনে যেন

একটা আন্দোলন-আন্দোলন ভাব। মানুষ মারার জন্যে আমরা কত সব রোগ সৃষ্টি করলাম, কিন্তু শালা সৃষ্টিছাড়া মানুষগুলো আমাদের ওপর টেক্কা দিয়ে এমন সব ওষুদ তৈরী—

রাম ॥ [প্রচণ্ড রেগে যায়] দেখুন, গালাগালি দেবেন না। 'উইড্র' করুন।

নারদ ॥ মানে ?

রাম ॥ মানে ক্ষমা চেয়ে নিন।

নারদ ॥ কি ! আমি ওপরের মহাজন, আমি চাইবো ক্ষমা ?

রাম ॥ আপনি যেখানকার মহাযম হ'ন না কেন, এখন আমাদের পাড়ায় এসেছেন, ক্ষমা না চাইলে পেঁদিয়ে বৃন্দাবন ছুটিয়ে দেব। [হাত গোটায়]

নারদ ॥ দেখুন, ভাল হবে না বলে দিচ্ছি। আপনাকে আর এখানে বাঁচতে দেব না। এখুনি ওপরে গিয়ে 'রিপোর্টি' করে দেব।

রাম ॥ করুন গে না কেন।

মা ॥ রাম, চা নিয়ে যা বাবা। [রাম রাগে গজ গজ করতে করতে ভেতরের ঘরে গিয়ে চা নিয়ে এসে নারদকে দেয়।]

রাম ॥ এই নিন। নেহাত্ চা হয়ে গেছে তাই—ভদ্রলোকের ছেলে এইটুকু খেয়ে কেটে পড়ুন।

নারদ ॥ আবার চা কেন ? আমার কাছে তো বোতল ছিল।

রাম ॥ ওসব ওপরে গিয়ে খাবেন আমার ঘরে চলবে না।

নারদ ॥ [কাপ নিয়ে] আপনি অমন ভাবে চট্ছেন কেন ? [স্বগত] এখানকার মানুষগুলো কেমন যেন রগচটা-রগচটা হয়ে যাচ্ছে।

রাম ॥ আমায় কিছু বলছেন ?

নারদ ॥ [চায়ে মুখ দিয়ে] আজ্ঞে না, মানে আপনারা বেশ সুখেই আছেন।

রাম ॥ সুখে আছি ?

নারদ ।। আজ্ঞে হ্যাঁ। বেশ সবাই কেমন দিব্বি খাচ্ছেন-দাচ্ছেন —বেশ সুখেই—

রাম ।। [ধমক দেয়] চোখ আছে ?

নারদ ।। কি বললেন ?

রাম ।। বলছি চোখ আছে ?

নারদ ।। আজ্ঞে হ্যাঁ—এইতো। [নিজের চোখ দেখায়]

রাম ।। [বিদ্রূপ] আজ্ঞে না। এই সহর থেকে ভাল ডাক্তার দেখিয়ে চশমা নিয়ে যান। তারপর ভাল করে দেখে সবকিছু বলুন। [রাগে গর্জে ওঠে] আপনারা সব যাচ্ছেতাই। আপনাদের স্বর্গে কিছুই নেই আপনারা অপদার্থ—যতসব ফুলস্।

নারদ ।। হা-হা-হা! একি বলছেন! ওখানে সব নানা ধরনের ফুল আছে। গোলাপ, যুঁই, কনকচাঁপা—আরো কত কি! সব একেবারে গিজ গিজ করছে।

রাম ।। গিজ গিজ করছে ?

নারদ ।। আজ্ঞে হ্যাঁ। আর কেনই বা হবে না বলুন। এখান থেকে যারা যাচ্ছে তারা থাকার জন্য কত সুন্দর সুন্দর জায়গা পাচ্ছে। এক-একটা লোকের জন্যে ডবল রুমের ফ্লাট। সঙ্গে ফুলের বাগান, অত্যন্ত কম ভাড়ায়। এর উপরও তাদের বায়নাক্কা—ঘরটা এয়ার-কন্‌ডিসান করে দাও। তাও দেওয়া হচ্ছে। অবশ্য যারা এখানে মরার চান্স পাবে তারাই এ সুযোগ পাবে। [চা খেয়ে চায়ের কাপ রাখে]

রাম ।। [বিনীত ভাবে] একটা কথা বলবো ?

নারদ ।। বলুন—তবে এভাবে তেড়ে এলে আমি কি করে শুনি বলুন।

রাম ।। অন্যায় হয়েছে। আর তেড়ে যাবো না।

নারদ ।। বেশ, বলুন।

রাম ।। আপনাদের ওপর ওয়ালাদের বলেক'য়ে আমার একটা মরার চান্স করিয়ে দিন না। এখানে বড় অসুবিধায় আছি। এক

মাস হল একটা কারখানায় ঢুকেছি, তাও ফুরনে কাজ করতে হয়। হপ্তা ঠিক মত পাওয়া যায় না। তাই—যদি একটা—

নারদ ॥ দাঁড়ান দাঁড়ান চিত্রবাবুর সঙ্গে এবিষয়ে 'কনসেলেট'র করে দেখবো। যদি কোন—

রাম ॥ চিত্রবাবু কে ?

নারদ ॥ আপনি চিত্রগুপ্তকে চেনেন না ? ওঁর কাছেই সব খবরটবর থাকে। এখন উনিই হচ্ছেন স্বর্গের 'চীফ্ একাউনটেণ্ট'।

রাম ॥ দেখুন না স্যার, বাড়ীতে বৃদ্ধা মা—ঠিক মতন আহার পান না—আধবেলা খেয়ে কোন রকমে বেঁচে আছি—আর চলছে না—তারপর মাথার ওপর বিবাহ যোগ্যা বোন।

নারদ ॥ [উৎফুল্ল হয়ে] বোন ! বয়েস কত ?

রাম ॥ তা প্রায় আঠার-উনিশ হবে।

নারদ ॥ দেখতে কেমন ?

রাম ॥ ভালই—লোকে তো বলে।

নারদ ॥ দাঁড়ান, আমি আজই এবিষয়ে মহাদেবের সঙ্গে কথাবার্তা বলছি। [কানে কানে] এসব বিষয়ে মহাদেবের ভীষণ 'ইন্‌টারেষ্ট'। তিনি যদি একবার দয়া করেন তবে আর রক্ষে নেই। যা হোক একটা না একটা ব্যবস্থা হবেই হবে। আমি এখুনি যাচ্ছি—[নারদ যেতে গিয়ে থেমে যায়।] আচ্ছা, আপনি জেনেশুনে কোন পাপ করেছেন ?

রাম ॥ কেন বলুন তো ?

নারদ ॥ একটু ভেবে দেখুন না।

রাম ॥ [ভেবে] আজ্ঞে মনে তো পড়ছে না।

নারদ ॥ দেখুন, আমাদের ওখানে চান্‌স্ নেবার দু'টো উপায় আছে। যদি স্থায়ীভাবে থাকতে চান তবে জেনেশুনে পাপ করুন—আর যদি অস্থায়ীভাবে থাকতে চান তবে ভাল ভাল কাজ

করুন—নামডাকের চোটেই আমরা আপনাকে ওপরে তুলে নেব।

রাম ॥ দেখুন, ও দু'টোর কোনটাই আমার নেই।

নারদ ॥ তবে এখানেই আপনি থাকুন—না খেয়ে মরুন। স্বর্গে যাবার চান্স আপনি পাবেন না। তবে আপনার কথা আমরা নিশ্চয়ই ভেবে দেখবো—বিশেষত আপনার যখন একটা সুযোগের আশা আছে—। দেখুন আপনার কাছে এসে স্বর্গ সম্বন্ধে যে এত সব কথা বলে গেলাম, এসব কথা কিন্তু কারোর কানে তুলবেন না—তা হলে আমার ওপরের 'পারমানেণ্ট' পোষ্টটা চলে যাবে।

রাম ॥ না, না—আমার কি দরকার।

নারদ ॥ মানে বুঝতেই তো পারছেন—আমিও আপনাদের মত ছাপোষা মহাজন। তবে আপনার কথা আমি নিশ্চয়ই ভেবে দেখবো।

রাম ॥ মনে রাখবেন কিন্তু স্যার!

নারদ ॥ [দু'এক পা এগিয়ে আবার ফিরে আসে।] দেখুন, একটা কথা বলি—কানে কানে—অন্যায় নেবেন না।—একটু অসৎ হোন, এত সৎ হলে আপনি মরার চান্স কিছুতেই পাবেন না। এখানেই গলেপচে মরতে হবে। নারায়ণ! নারায়ণ! [নারদ চলে গেল। রাম চিন্তিত হয়ে বিছানার ওপর বসে পড়ে। মা পাশের ঘর থেকে হ্যারিকেন হাতে ঘরে ঢোকে।]

মা ॥ [নেপথ্যে] রাম! বাবা—ওঠে পড় বাবা। [প্রবেশ করে] রাম, বাবা উঠে পড়। কিরে! উঠে বসে আছিস? [গায়ে হাত দেয়] রাম!

রাম ॥ [চমক ভাঙে] কে?—ও, মা!

মা ॥ যা উঠে পড়—দু'টো বাজে।

রাম ॥ [অবাক হয়ে] কোথায়?

মা ॥ বা-রে ! চালের দোকানে লাইন দিতে হবে না ?

রাম ॥ এত রাতে—

মা ॥ এখনই কত লোক এসেছে—কি বিরাট লাইন ! চাল পাওয়া যাচ্ছে না বাবা । ঘরে এক মুঠো চাল নেই ।

রাম ॥ মা, আমি যে হপ্তা পাইনি ।

মা ॥ সে কি রে ! কালই তো হপ্তা পাবার কথা ছিল ।

রাম ॥ তুমিই বল, আমি কি করবো ?

মা ॥ তা হলে রান্না হবে কি করে ?

রাম ॥ পূজোর বোনাসের দাবীতে কারখানায় তালাচাবি পড়েছে —দাবী না মিটলে টাকা পাওয়া যাবে না ।

মা ॥ কবে দাবী মিটবে বাবা ?

রাম ॥ বাবুরা জানেন ।

মা ॥ এই ক'দিন কি করে চলবে বাবা ?

রাম ॥ যেমন ভাবে আগে চলেছে ঠিক তেমনি ভাবে । পঞ্চাশ টাকা মাইনের ঠিকেদারী মজুরের চল্লিশ টাকা মন চালের ভাত খাওয়ার শখ না করাই ভাল মা । এমনি ভাবে যতদিন বাঁচা যায় ততদিন বাঁচবো [মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আশার আলো দেখে] তবুতো আমদের মা আছে ।
[উঠে দাঁড়িয়ে মায়ের বুকে মাথা রাখে] যদি মরতে হয় মায়ের বুকে মাথা রেখে এমনি ভাবে মরবো !

[মা রামের মাথার ওপর হাত বোলাতে থাকে । ধীরে ধীরে মঞ্চের পর্দা দু'পাশ থেকে মিলে এক হয়ে যায় ।]

॥ আলো ॥

॥ আলো ॥

॥ চরিত্র ॥

নাট্যকার, রামদুলাল ভূতনাথ,
রাজকৃষ্ণ বাবু, নরেন চৌধুরী,
আদালতের পেয়াদা, ভদ্রমহিলা।

[পর্দা দু'পাশে সরে যেতেই দেখা গেল--শহরের একটা মাঝারী রাস্তা। এই রাস্তার কিছু দূরে বড় রাস্তা—কোলাহল-পূর্ণ (দৃশ্যে যা দেখা যাচ্ছে না)। রাস্তার ধারেই--তিনটে বাড়ী। প্রথমটা দোতলা—মধ্যবিত্তের। দ্বিতীয়টা উচ্চবিত্তের—তিনতলা। তৃতীয়টা নিম্নবিত্তের—টালির চালের। দ্বিতীয় বাড়ীর সামনে ডাষ্ট্‌বিন। পথে একটি মাত্র আলো। দ্বিতীয় বাড়ীর সাথে একটা রোয়াক আছে। সন্ধ্যে এবারে হবে। নাট্যকার প্রবেশ ক'রে টালিচালের বাড়ীর একপাশে দাঁড়ালেন। নিশ্চুপভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে সমস্ত পরিবেশ-টাকে পর্যবেক্ষণ করলেন। তারপর বড় রাস্তার দিকে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। দেখতে পেলেন প্রথম বাড়ী থেকে প্রখ্যাত নাট্যকার রাজকৃষ্ণবাবু বেরিয়ে এলেন। শশব্যস্ত ভাব। হাতে প্রকাণ্ড একটা খাতা আর একটা কলম। কিছুক্ষণ রাস্তার ওপর দিয়ে পায়চারী করলেন। তারপর—]

রাজকৃষ্ণ ॥ সব ভেস্তে যাচ্ছে। একমাস ধরে এখনো কাঠামোটাকেই দাঁড় করাতে পারলাম না! ছিঃ ছিঃ! বাস্তব ছেড়ে কল্পনার জগৎকে তোলপাড় করে ফেললাম—কিন্তু একটা হিরোইন্ জোগাড় করতে পারছি না! আর কতদিন

অপেক্ষা করবো? এদিকে হলের ম্যানেজারের তাগাদা, ওদিকে প্রেসওয়ালার তাগাদা—বাস্তবধর্মী নাটক চাই। বাস্তব! বাস্তব! বাস্তব! চেষ্টা আপ্রাণ করেও মাঝে মাঝে ব্রেক হয়ে যায়। নাটকটা শেষ পর্যন্ত দাঁড়াবে তো?

[টালির চালের বাড়ী থেকে রামদুলালের কর্কশ কণ্ঠ শোনা গেল।]

রামদুলাল॥ আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু—এভাবে একবছর পুরো হল; আর সহ্য হয় না। [থালা বাসন ছুঁড়ে ফেলার শব্দ] তোকে আজ তাড়িয়ে তবে ভাত খাবো। আমি আদালতের পরোয়ানা এনেছি, সঙ্গে পেয়াদা এনেছি। আজ বাছাধন যাবে কোথা? বেরিয়ে যা শীগ্‌গীর—কি হ'ল, কথা কানে যাচ্ছে না বুঝি? আঃ মর! মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে আছিস্ যে? বেরো আগে—ওসব ঢঙ্ দেখিয়ে আর মন টলাতে পারবি না। স্বামী তো রকম সকম দেখে প-এ আকার দিয়েছে। কত ন্যাকামো দেখলুম। আবার সেদিন নেকি বলে কি না—ছেলের অসুখ, কিছু সাহায্য করতে হবে। মা হয়ে ছেলের দায়িত্ব নিতে পারিস্ না? পেটে খাবার মুরোদ নেই তার ওপর আবার ছেলে? মরেও না!

শখ কত! বাড়ীতে ভাড়া না দিয়ে বাস করবে। এই, ছেলে কোলে করে বসে আছিস যে—আবার কান্না হচ্ছে! আমি আজ আর ছাড়ছি না। কাল নতুন ভাড়াটে আসবে, তাড়াতাড়ি বেরো। তবে রে—[ঘাড় ধরে রামদুলাল ভদ্রমহিলাকে বাড়ী থেকে বের করে দিলেন। বাচ্চাটা ভদ্রমহিলার বুকে।] যা না অন্য পাড়ায়—ঘর জুটবে। [ভদ্রমহিলা অসহায় অবস্থায় কি করবে ভেবে না পেয়ে ডাষ্ট্‌বিনের একপাশে এসে আশ্রয় নিল।] যাবে না আবার, ওর ঘাড় যাবে [ভদ্রলোক যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। একটা বিড়ি ধরিয়ে তাতে একটা

আমেজি টান দিয়ে বললেন—] আঃ বাঁচা গেল ! এগার মাসের ভাড়া দিল না বটে, কিন্তু নতুন ভাড়াটের ভাড়া মাসে পাঁচ টাকা বেশী ! যাই ঘরটা গুছিয়ে রাখিগে।

[রামদুলাল বাড়ীতে অদৃশ্য হলেন।]

পেয়াদা ॥ (ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ধীরে ধীরে ভদ্রমহিলার কাছে গিয়ে) কিছু মনে করবেন না মা। আমাদের কাজই হচ্ছে এই। পেটের দায়ে আমাদের এ চাকরী করতে হয়। (ভদ্রমহিলা করুণনেত্রে তার দিকে চেয়ে রইলেন।) কি করব মা, নালিশ করেছে বাড়ীওয়ালা, হুকুম দিয়েছে আদালত—আমরা ত হুকুম তালিম করি মাত্র। (ভদ্রমহিলা কোন কথা বললেন না। শুধু শিশুটিকে বুকে চেপে ধরলেন। ভদ্রমহিলার এই স্তব্ধ মূর্তি দেখে পেয়াদা ও যেন কেমন থতমত খেয়ে গেল।) তাহলে, আমি যাই মা। অপরাধ নেবেন না। (মাথা নীচু করে পেয়াদা দু'পা গিয়ে ফিরে এসে) ভগবানই আপনাকে আশ্রয় দেবেন। গরীবকে তিনিই ত স্থান দেন।—[প্রস্থান]।

রাজকৃষ্ণ ॥ [ডাষ্টবিনের পাশে ভদ্রমহিলাকে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে—] দি আইডিয়া! পেয়েছি! নায়িকা খুঁজে পেয়েছি। কিন্তু একটা সমস্যা। নায়িকার এত দৈন্য··· এত বড় গম্ভীর নায়কের পাশে বেশ জুতসই হবে না। বেখাপ্পা হবে। দূর ! এর জন্যে এত বড় প্লট ? জাদরেল ভিলেন! বাস্তব! বাস্তব! বাস্তব নিয়ে সবাই পাগল। বাস্তব কিছুতেই হবে না। ভেজাল একটু আধটু হবেই হবে। আর ভেজাল না হলে তো কারোর সুখ নেই—কি পাঠক, কি লেখক। বড় কবির যত সব বড় বড় কথা—"সে কবির লাগি আমি কান পেতে আছি, যে আছে মাটির কাছাকাছি"। বোগাস!

[মাতাল অবস্থায় নরেন চৌধুরীর প্রবেশ।]

নরেন ॥ পথের ওপর দিয়ে চলতে চলতে পথটা ক্রমশঃ সরে যাচ্ছে। যত ভাবি ধাক্কা খাবো না—ব্যাটা বাড়ী-গাড়ীগুলো তত ধাক্কা মারবে। রাস্তাটা এত অন্ধকার কেন? আজ সব জায়গাই অন্ধকার। পেয়ারীর কাছে গেলুম—পেয়ারী দুইশোতেও রাজী হ'ল না। কপাট চোখের সামনে বন্ধ করে দিল। ঠিক হ্যায়। কুছ্ পরোয়া নেই—হাম পেয়ারীকো দেখ লেগা। আমি রায়বাহাদুর অনাদি চৌধুরীর সুযোগ্য সন্তান। আমার বাবা এইরকম কত পেয়ারীকে চরকিবাজী ঘুরিয়েছে। বাবা রোজ দু'বোতল খেত, আমি খাবো চার বোতল—বাবার সম্মান আমাকে রাখতেই হবে। ভূতো—বাবা ভূতো! আমার বাড়ীর দরজাটাও তুমি বন্ধ করে রেখেছ বাবা! আজ সব জায়গাতেই 'প্রবেশ নিষেধ'?

[ভূতো বড়বাড়ীর দরজা খুলে বাবুকে দেখে অবাক হয়ে পড়ে।]

ভূতো ॥ বাবু, আপনি এখন যে!

নরেন ॥ এই যে বাবা ভূতনাথ, তোমাকেই এতক্ষণ স্মরণ করছিলুম। তা বাবা, সারা শহরটা আজ অন্ধকার কেন? রাজ্যের সব আলো জ্বালিয়ে দাও। [মাটিতে পড়ে গিয়ে আবার ওঠার চেষ্টা করে। গানের সুর মুখে—।] ক্যায়া করুঁ সজনী আয়ে না বালাম—সুরগুলোও কেমন বেসুরো হয়ে যাচ্ছে। মেলাচ্ছি—মেলাতে মেলাতে ঠিক মেলাতে পারছি না। পেয়ারী না হলে কি সুর আসে? [ডাষ্টবিনের ধারে ভদ্রমহিলার দিকে চোখ পড়তেই—] এই যে পেয়ারী—তুমি আমার বাড়ীর সামনে হাজির হয়েছো? তা বেশ। কিন্তু তুমি অমনভাবে মনমরা হয়ে ডাষ্টবিনের ধারে বসে কেন? দেখতে পাচ্ছো না ওখানে সিগ্ন্যাল রয়েছে—শাস্তি ছুঁইলে ময়লা পাইবে,—

Sorry, ময়লা ছুঁইলে শাস্তি পাইবে। ওখান থেকে সরে এসো পেয়ারী। আমার হৃদয়-মন্দিরে প্রবেশ করে সবকিছু আলোকিত করে দাও। ওভাবে বসে থেকে লজ্জা দিও না পেয়ারী। তোমার মায়ের সঙ্গে আমার বাবার না হয় একটু খটাখটি ছিল। কিন্তু তাতে কি হয়েছে! আমি তোমাকে সাতশ'ই দেব—এত কষ্ট করে যেকালে আমার বাড়ীতে এসেছো—[ধরতে যায়]

ভূতো ॥ বাবু ছোঁবেন না—এটা একটা ভিখিরী।

নরেন ॥ ভিখিরী!

ভূতো ॥ কোলে আবার একটা মরা ছেলে।

নরেন ॥ মরা ছেলে! ভিখিরী? ওসব চলবে না। ভিখিরী-টিকিরী চলবে না। হিঁয়াসে ওসব হাঠাও!

[টল্‌তে টল্‌তে ভদ্রমহিলাকে একটা লাথি মেরে বড় বাড়ীতে ঢুকে পড়লো। বড় বাড়ীর দরজা বন্ধ হয়ে গেল। রাজকৃষ্ণ লিখ্‌লেন।]

নাট্যকার ॥ নমস্কার।

রাজকৃষ্ণ ॥ নমস্কার। আপনি?

নাট্যকার ॥ চিনবেন না।

রাজকৃষ্ণ ॥ মানে?

নাট্যকার ॥ মানে আমি কে, আমার পরিচয় কি, তা আপনি ঠিক বুঝবেন না। যাক্, আপনি বোধহয় লেখেন?

রাজকৃষ্ণ ॥ বোধহয় নয়, লিখি। আর লিখি নাটক—

নাট্যকার ॥ মানে নাট্যকার?

রাজকৃষ্ণ ॥ ঐ রকম একটা কিছু।

নাট্যকার ॥ নিশ্চয়ই লিখবেন, দেখবেন—লিখ্‌বেন।

রাজকৃষ্ণ ॥ আপনিও বুঝি লেখেন?

নাট্যকার ॥ না, দেখি।

রাজকৃষ্ণ ॥ মানে?

নাট্যকার॥ 'দেখি'—মানে জানেন না? দেখি মানে সবকিছু প্রত্যক্ষ করি। বড় কথায়—সমাজ, মানুষ, এমন কি আপনাদের সার্থক সৃষ্টিও।

রাজকৃষ্ণ॥ না, আমি ঠিক তা বলছি না। আমি জানতে চাইছি আপনি কি করেন, মানে আপনার পেশা—।

নাট্যকার॥ পেশা আমার কিছু নেই। তবে একটা নেশা আছে। পৃথিবীটাকে একবার ঘুরে দেখার ইচ্ছে আছে।

রাজকৃষ্ণ॥ ঠিক বুঝলাম না।

নাট্যকার॥ বুঝে ঠিক লাভও হবে না। যাক্, তা অনেক কিছু দেখলেন তো—কিছু পেলেন?

রাজকৃষ্ণ॥ অনেক কিছু—চোখে দেখা মানুষের একটা মহৎ নাটক। খাঁটি বাস্তব। ভেজাল এতটুকু নেই। কবির কথায়—"জীবনে জীবন যোগ করা" মানুষের কাহিনী—মনগড়া ফাঁপা মানুষ নয়।

নাট্যকার॥ অপূর্ব!

রাজকৃষ্ণ॥ বলছেন?

নাট্যকার॥ না বলছি না। অবাক হচ্ছি।

রাজকৃষ্ণ॥ কেন?

নাট্যকার॥ আপনারা এ যুগের শ্রেষ্ঠ পথিক—মানে অন্যতম অগ্রদূত।

রাজকৃষ্ণ॥ জানেন এমন সৃষ্টি করতে হবে যা কেউ করেনি। অন্তরের সঙ্গে অন্তরের যোগ সাধন করে সরাসরি তাদের তুলে ধরব—এটাই আমার অন্তরের কামনা।

নাট্যকার॥ সত্যিই তো—আজকের সব চেয়ে যেটা বড় প্রয়োজন অর্থাৎ 'গণনাট্য আন্দোলনে জন অধিকার প্রতিষ্ঠা'—তা' আপনাদেরই করতে হবে।

রাজকৃষ্ণ॥ মানুষের কথা চিন্তা করি—গভীরভাবে অনেক সমস্যা অনুধাবন করি, কিন্তু প্রয়োগের সময় সুর কেটে যায়।

নাট্যকার ॥ অর্থাৎ আপনি বলতে চাইছেন বাস্তব তখন অতিবাস্তব হয়ে উঠে।

রাজকৃষ্ণ ॥ হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন।

নাট্যকার ॥ কিন্তু তা হলে তো চলবে না। বাস্তব সব সময় বাস্তব। তাই বাস্তবের সার্থক রূপায়ণের জন্য চাই খাঁটি বাস্তববাদী মন।

রাজকৃষ্ণ ॥ এ হিসেবে কিন্তু এদেশে আমার প্রচুর নাম আছে। এ দেশের বড় বড় লোকেরা আমাকে সার্থক গণনাট্যকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

নাট্যকার ॥ তাই নাকি!

রাজকৃষ্ণ ॥ হ্যাঁ। 'কুয়াশা' নাটকটার জন্য আমি সরকারের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার পেয়েছি।

নাট্যকার ॥ কুয়াশা!

রাজকৃষ্ণ ॥ হ্যাঁ—কয়াশা। আপনি জানেন না? একটা 'হিট ড্রামা'। বাস্তবতার সার্থক রূপায়ণ। বিখ্যাত নাট্যকার এবং নাট্যসমালোচক ডঃ বিশ্বনাথ রায় বলেছেন— আমাদের আশে-পাশের মানুষদের সঙ্গে আমারাই যেন সরাসরি অভিনয় করছি। গণনাট্য আন্দোলনের একটা সার্থক দৃষ্টান্ত। শহরের বুকে এটা একটানা দু'হাজার রজনী অভিনীত হয়েছে।

নাট্যকার ॥ প্লট-টা কি ছিল বলুন তো?

রাজকৃষ্ণ ॥ কেন, আপনি জানেন না। সেই যে ঝিয়ের মেয়ের সঙ্গে জমিদারপুত্রের প্রণয়—পরিণতিতে জীবনের শোচনীয় পরাজয়—অর্থাৎ ট্র্যাজেডি! বড় বেদনা পেলাম!

নাট্যকার ॥ কেন?

রাজকৃষ্ণ ॥ এত ভাল প্রোডাক্শন্টা একবার দেখলেন না! শুধু আলোর কাজের জন্যে খগেনবাবু মাসে তিন হাজার

টাকা বেতন পান। এ রকম জিনিস পয়সা খরচ ক'রে দেখা যায় না।

নাট্যকার ॥ তাই নাকি!

রাজকৃষ্ণ ॥ জানেন, পয়সা দিয়েও অনেকে দেখার সুযোগ পায়নি। নাটক দেখে দর্শকরা কতখানি যে বিমোহিত হয়েছিলেন, তা আমি আপনাকে কি দিয়ে বোঝাবো? দর্শকরা ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, ঘন ঘন হাততালি দিয়ে নাট্যকারকে সম্বর্ধনা জানিয়েছেন। হলের ম্যানেজার আবার নতুন বাস্তবধর্মী নাটক লেখার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। সেই নতুন নাটকের একটা প্রাথমিক খসড়াও আমি তৈরী করে ফেলেছি। এই দেখুন—নায়ক বিলেত ফেরত F. R. C. S., ভিলেন M. B. B. S. একটা জাল ডাক্তার। এই ডাক্তারই F. R. C. S. নায়কের যে নায়িকা তার প্রণয় প্রতিদ্বন্দ্বী।

নাট্যকার ॥ সবই তো হ'ল কিন্তু প্রণয়িণী কোথায়?

রাজকৃষ্ণ ॥ সেই তো হয়েছে মুস্কিল। সেই নায়িকার খোঁজ আজ বহুদিন থেকে করে চলেছি। ডাষ্টবিনের ধারে যাও বা একজনকে পেলাম—তাকে আবার আধুনিক দর্শকেরা স্বীকার করবেন না। তাই একটু পালটে একে সাধারণ ঘরের একটা মেয়ে সাজালাম—একস্ট্রা কোয়ালিফিকেশন, একটা বড় হাসপাতালের সামান্য একটা নার্স। মাতালটাকে একটা সিচুয়েশনে ঢুকিয়ে দিয়েছি। মন্দ মানাবে না। শেষটুকু এখনও আসেনি।

নাট্যকার ॥ আসবে, নিশ্চয়ই আসবে।

রাজকৃষ্ণ ॥ মানে দেখতে হবে—তবে তো লিখব। খাঁটী বাস্তব না হলে আবার আজকের দর্শকেরা তা নেবেন কেন? আপনি আমার এই নাটকটা দেখবেন কিন্তু। অভিনয়ের আগে ছাপা বইও বেরুবে। দাম করবো আড়াই টাকা।

নায়িকার মুখে নেপথ্য সংগীত যোজন করবেন মধুকণ্ঠী মণিকা দে।

নাট্যকার ॥ এই নায়িকার মুখে গান!

রাজকৃষ্ণ ॥ হ্যাঁ গান—বসন্তের হাওয়া যখন বইবে তখন নদীর ধারে নায়কের কাছে নায়িকা প্রেম নিবেদন করবে একটা মুখরোচক গান দিয়ে।

নাট্যকার ॥ এই জীবনে প্রেম——গান——আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

রাজকৃষ্ণ ॥ এই সেরেছে! প্রেম-গান না হলে পয়সা দিয়ে দর্শক নাটক দেখবেন কেন? তা ছাড়া এই উপকরণগুলো একেবারে খাঁটি বাস্তব। আর আজকের বাস্তব মানে প্রেম, প্রেমের পরাজয় নতুবা প্রেমের জয়। এ যুগের বড় বড় নাট্যকারদের নাটকে এর বহু নজীর আছে। কি হ'ল আপনি চলে যাচ্ছেন যে? চলে যাচ্ছেন! তা যান; তবে সময় মত নাটকটা দেখবেন কিন্তু। আমিও যাই। শেষটুকু আমায় শীগ্‌গীর তৈরী করতে হবে।

[রাজকৃষ্ণ প্রথম বাড়ীতে ঢুকে পড়লেন। নাট্যকার বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে পড়লেন। এই পরিবেশ এবং নাট্যকার রাজকৃষ্ণকে সহ্য করতে না পেরে বলে উঠলেন—]

নাট্যকার ॥ আলো, আলো—আলো চাই!

[পর্দা দু'পাশ থেকে এক হয়ে গেল।]

৭

॥ প্রান্তসীমায় ॥

॥ প্রান্তসীমায় ॥

॥ চরিত্র ॥

রাজা : রাণী : ? ১ : ? ২ :

[একটা ঘর। বাইরে থেকে তালা দেওয়া। আবছা অন্ধকার। আবছা অন্ধকারেই কথাবার্তা চলবে। একজন চেয়ারে বসে। অপর জন দাঁড়িয়ে।]

? ১—এখানে এসেও তুমি মন ভার করে বসে থাকবে? নাঃ! তোমাকে নিয়ে ভীষণ মুস্কিলে পড়েছি। এতটা পথ বেয়ে। যে কেন এলাম!

? ২—আমার ভাই কিছুই ভাল লাগছে না। তোমার সঙ্গে বেড়িয়ে প্রাণ খুলে কাঁদতেও পারছি না!

? ১—হা—হা—হা।

? ২—অমন করে হাসছ যে?

? ১—হাসছি তোমার কথা শুনে। বয়েস হয়েছে অথচ কেমন বোকার মত কথা বল।

? ২—বোকার মত কথা বললাম?

? ১—তা নয়তো কি? প্রাণখুলে কেউ আবার কাঁদতে পারে নাকি?

? ২—কেন পারবে না? আমি তো পারি—আর প্রাণ খুলেই পারি।

? ১—ওটা তোমার অভ্যাস।

? ২—তোমার জ্ঞানের পুঁথিতে এই প্রাণখোলা কান্নার কোন অর্থ খুঁজে পাবে না।

? ১—তুমি একটু ভারি চালের জিনিস—তোমার কথা আমার প্রাণখোলা খুশির কাছে এলে উড়ে যাবে। তার চেয়ে বরং আমার একটা কথার জবাব দাও।

? ২—কি, বল ?

? ১—আচ্ছা, হাসতে তোমার কোথায় বাধা বলতো ?

? ২—হাসিটা তোমার অভ্যাস আর কান্নাটা আমার অভ্যাস—তোমার যা, তা আমার কি করে হবে বল ?

? ১—কিন্তু কথা হচ্ছে, তুমি একবার হাসতে চেষ্টা করনা কেন।

? ২—মাপ কর ভাই। ওটা আমার সয় না। তার চেয়ে বরং তুমিই একটু কাঁদতে চেষ্টা কর।

? ১—আমি! আমার কিসের দুঃখ! আমার এই সারা দুনিয়াটাই আনন্দময়—এখানে শুধু শুধু তোমার মত একলাটি কেঁদে মরবো কেন ?

? ২—আমার কি মনে হয় জান ?

? ১—কি ?

? ২—ঠিক উল্টো। সারা দুনিয়াই দুঃখের। এই দুনিয়ার প্রতি পলে পলে জমে আছে জমাট বাঁধা বেদনা।

? ১—হা—হা—হা।

? ২—আবার হাসছ ?

? ১—তুমি ভীষণ বোকা।

? ২—আমি!

? ১—তা নয়তো কি ? আমার রাজত্বটা বেমালুম তুমি নিজের নামে চালাতে চেষ্টা করছো।

? ২—তুমি তো সাংঘাতিক লোক!

? ১—কেন ?

? ২—আমার জিনিস সব সময় আমার। সেটা আবার তোমার কবে হ'ল ?

? ১—তাই নাকি—এ রাজত্বটা তা হলে তোমার ?

? ২—একশো বার। এই দুনিয়াতে ক'টা লোক তোমার মত বোকা সেজে হো হো করে হাসছে বলতো ?

? ১—তুমি নেহাত অন্ধ। অবশ্য তোমারও দোষ নেই। বয়েস যথেষ্ট হয়েছে। তাই আমার জগৎকে দেখতে গেলে চোখের ছানি কাটাতে হবে।

? ২—বেশ তো, প্রমাণ হোক না। শেষ বয়সে না হয় তোমার রাজত্বের মহিমাটাই দেখে যাই।

? ১—একটু অপেক্ষা কর। এ-বাড়ীর লোকজন আসুক তারপর না হয় রাজত্বের ভাগ-বাটরা হবে।

? ২—বেশ তাই হবে। এরা বোধ হয় এসে গেছে। তুমি ঐ পাশটায় সরে দাঁড়াও—আমি এইখানে থাকি।

[দু'জনে দু'পাশে সরে যাবার পর ঘরের দরজা খুলে নবদম্পতি প্রবেশ করল। মঞ্চ তীব্র আলোকচ্ছটায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।]

রাজা ॥ হা—হা—হা!

রাণী ॥ হি—হি—হি—! দেখেছ তুমি যখন সই করছিলে তখন ঐ বুড়োটা কেমন ড্যাব ড্যাব করে দেখছিল!

রাজা ॥ তুমি কিন্তু ভয় পেয়ে গিয়েছিলে।

রাণী ॥ কখ্খনো নয়। একটু নারভাস্ হয়েছিলাম বৈ নয়। [রাজা রাণীর মুখের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।] তুমিও তো ভয় পেয়েছিলে—কি, অমন করে দেখছো কি?

রাজা ॥ তোমাকে—[হাত চেপে ধরে] মানে আমার রাণীকে।

রাণী ॥ কেন? এর আগে কি আমায় দেখনি?

রাজা ॥ দেখেছিলাম, তবে সেটা ছিল ইল্‌লিগ্যাল দেখা—আর আজকের দেখাটা লিগ্যাল—মানে এমন মধুর পরিবেশে—নীরবে নিভৃতে—। তা'ছাড়া তুমি এখন আমার সব—গভর্মেণ্ট তোমাকে আমার স্ত্রী হতে অনুমতি দিয়েছে। তুমি এখন আমার সবচেয়ে কাছের মানুষ। কাছে পাবার জন্যে তোমাকে আর দূরে দূরে খুঁজতে হবে না।

রাণী ॥ তা তো হ'ল। এইবার হাতটা ছাড়ো। [রাজা আবেগে হাত আরো কাছে টেনে নিতে চায়] এই—হচ্ছে কি ? হাত ছাড়—ছাড় না ! তুমি ভীষণ ছেলেমানুষ হয়ে পড়েছ।

রাজা ॥ অনেক দিন আগে।

রাণী ॥ আজ একটু বেশী।

রাজা ॥ নিবিড় করে কাছে পাবার মন্ত্রটা আজ নতুন করে নিলাম কি না।

রাণী ॥ ভাগ্যিস্ চাকরীটা পেয়েছিলে।

রাজা ॥ তা বটে। বেকার থাকলে ঐ লেকের ধারে আর আউটরাম ঘাটে ঘোরাঘুরি ছাড়া কোন উপায় থাকতো না। এখন প্রাইভেট কোম্পানীর সাড়ে তিন শ' টাকা মাইনের এ্যাসিস্টেন্ট সেলস্ ম্যানেজ্যার—এখন আমরা কাউকে মানি না—এখন একটা বিরাট কিছু করবো।

রাণী ॥ কে—তুমি ?

রাজা ॥ শুধু আমি নই, সঙ্গে সঙ্গে আমার রাণীও।

[রাজা রাণীকে নিজের বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে।]

রাণী ॥ দাঁড়াও, আমি ওঘর থেকে আসছি।

[রাণী পাশের ঘর থেকে মাথায় সিঁদুর লাগিয়ে ঘোমটা মাথায় দিয়ে এসে রাজাকে প্রণাম করে।]

রাজা ॥ এই—কি হচ্ছে কি ?

রাণী ॥ এটা আমাদের করতে হয়—স্বামীর মঙ্গলের জন্যে। (রাজা আর-এক বার মুগ্ধদৃষ্টিতে রাণীর দিকে তাকায়।)

রাণী ॥ নাও—চল।

রাজা ॥ রাণী, তুমি এত সুন্দর ! তোমাকে কী—কী অদ্ভুত—মানে—

রাণী ॥ মানে—পাগল !

রাজা ॥ কে ?

রাণী ॥ তুমি।

রাজা ॥ আমি ?

রাণী ॥ হ্যাঁ মশাই—হ্যাঁ।

রাজা ॥ কেমন?

রাণী ॥ বৌ-পাগল।

[কথাটা বলে এড়িয়ে যায়। রাজা রাণীর কাপড় ধরে টানে।]

রাজা ॥ আর তুমি?

রাণী ॥ জানি না।

রাজা ॥ তুমি হচ্ছ পাগলী।

[রাজা-রাণী উভয়েই হেসে ওঠে, হাসতে হাসতে ওরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। তারপর—]

? ১—কি এখনো রাজত্বে আশা করো?

? ২—এর পর সে আশা ত্যাগ করাই উচিত।

? ১—কি ভাবছ?

? ২—ভাবছি তোমার গর্বই খাটে।

? ১—হার মানলে তা হলে।

? ২—না মেনে উপায় নেই। তবে শেষ সময়—বয়েস আস্তে আস্তে কমে আসছে—তোমার মত যৌবন থাকলে একবার চেষ্টা করে দেখতাম।

? ১—এখনো গর্ব, তোমার এই অহংকারের জন্যই তুমি বুড়ো হয়ে পড়েছ।

? ২—তা ঠিক। কথাটা কি জান, তোমারটা আমি দেখতে পাই না। আমারটা তুমি দেখতে পাওনা। হাসির সীমারেখায় তুমি বাস কর—প্রাণ ভরে হাস, আর আমার সীমারেখায় আমি তোমার নাগাল পাইনে, তাই যার যতটুকু আছে সে তার ততটুকুকে নিজের সবটুকু বলে মনে করে।

? ১—মনে হচ্ছে তুমি গভীরে ঢুকছো।

? ২—আমার জগৎটা গভীরের—তোমারটা হাল্‌কা, তোমার সবটুকু খোলা। তাই কিছু না পেরে খালি হাসতেই পার—আর আমি কেবল কেঁদে মরি।

? ১—বলছি তো—আমার মত তুমিও একটু হাস না কেন ?

? ২—আমিও তো বলছি—ওটা আমার আসে না।

? ১—একটু চেষ্টা করে দেখ না।

? ২—এ জন্মে হবে না। তবে ভাবছি আসছে জন্মে তোমার ছেলে হয়ে জন্মাব।

? ১—হা—হা—হা—!

? ২—হাসছো যে !

? ১—তোমার লোভ দেখে।

? ২—আমার লোভ !

? ১—তা নয়তো কি ?

? ২—কি রকম !

? ১—তোমার জীবন তুমি সহ্য করতে না পেরে আমার ছেলে হয়ে জন্মাতে চাও।

? ২—কেন, তাতে আপত্তি আছে ?

? ১—আপত্তি কেন থাকবে ? আমার কাছে এলে তুমি খালি প্রাণ খুলে হাসবে—যাক্, তা'হলে হার স্বীকার করছো ?

? ২—তোমার দম্ভটাই যদি বড় হয়, তবে এই বুড়ো বয়সে আমিও তোমায় বলছি—না, হার আমি কিছুতেই স্বীকার করবো না।

? ১—কি করবে ?

? ২—এখানে আরো কিছুদিন থাকবো।

? ১—বেশ।

[আর কিছুদিন পর। মঞ্চ আলোকিত হবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল রাণী রাজার প্রতীক্ষায় অধীর হয়ে বসে আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজা বিষণ্ণ হৃদয়ে ফিরে আসে। অন্তরের বেদনাকে রাণীর কাছে প্রকাশ করতে সংকোচ বোধ করে।]

রাণী॥ তুমি এসেছ ? কোথায় ছিলেগো ? [কাছে এগিয়ে যায়] বাইরে কোন কাজে—না ? কি হ'ল, কথা ব'লছ না যে ?

রাজা ॥ আমার কিছুই ভাল লাগছে না।

রাণী ॥ শরীর খারাপ হয়নি তো, একটা চিঠি পর্যন্ত দাও নি। গেছ সেই বুধবার—আর আজ রবিবার। ভাবনা হয় না বুঝি। তোমার আর কি। নির্ভাবনার মানুষ। এদিকে আমার কত ভাবতে হয় বল তো!

রাজা ॥ রাণী, আমি যদি আর না আসতাম?

রাণী ॥ অমন কথা বলে না।

রাজা ॥ ধর,—যদি তোমায় ভুলে যেতাম?

রাণী ॥ ভুলতে তুমি কিছুতেই পারতে না। তবুও আমি তোমার জন্যে ঐ জানালার পাশটায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতাম।

রাজা ॥ তুমি অপেক্ষা করতে?

রাণী ॥ হ্যাঁ, যতদিন তুমি না ফিরতে ততদিন—ততদিন শুধু তোমার প্রতীক্ষায় থাকতাম—তোমাকে ভাবতাম—তোমার ঐ ছবিটার সঙ্গে কথা বলতাম। মনের ভেতরের মানুষটাকে ছেড়ে দিতাম তোমার খোঁজ নিতে। তুমি কাজে আটকে থাকলে সে মানুষটা এসে আমার কানে কানে খবর দিতো—বল্‌তো—তোমার রাজা ভাল আছে—তুমি কিন্তু ভেবো না। আমি তারপর চোখ বুজে তোমার ধ্যান করতাম আর তোমার প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে থাকতাম।

রাজা ॥ রাণী! তুমি আমায় খুব ভালবাস, না?

রাণী ॥ হঠাৎ এই কথা—হঠাৎ এমন উগ্র কবিত্বের কারণ কি?

রাজা ॥ কারণ! কারণ ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারবো না রাণী।

রাণী ॥ বুঝিয়ে আর দরকার নেই। নাও জামাটা ছাড়ো, হাতমুখ ধুয়ে নাও।—তারপর আবার কবিত্ব করা যাবে।

রাজা ॥ না রাণী, এটা কবিত্ব নয়।

রাণী ॥ তবে?

রাজা ॥ সত্যি। তোমাকে একটা কথা বলতে এসেছি।

রাণী ॥ তার মানে?

রাজা ॥ মানে এখুনি চলে যাবো।

রাণী ॥ কোথায় যাবে? অত কাজ ভাল নয়। যেখানেই যাও বিশ্রাম করে চা-টা খেয়ে তবে বেরুবে। দাঁড়াও, তোমার চা নিয়ে আসি।

রাজা ॥ দাঁড়াও।

রাণী ॥ কি?

রাজা ॥ এটা পড়ে দেখো তা হলেই বুঝতে পারবে।

[রাণী সবটুকু পড়লো। পড়ে অবাক হয়ে গেলো—বিস্মিত নয়নে ; রাজার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো—]

রাণী ॥ আমায় কি করতে হবে?

রাজা ॥ শুধু একটা সই।

রাণী ॥ শুধু একটা সই করলেই তুমি খুশি হবে?

রাজা ॥ আপাতত।

রাণী ॥ তার মানে?

রাজা ॥ মানে বিলেত থেকে ফিরে মল্লিকাকে ডিভোর্স করবো।

রাণী ॥ তুমি এত ছোট হয়ে পড়েছ!

রাজা ॥ রাণী, তুমি বুঝছো না কেন—মানে জনস্-কোম্পানীর ডিরেক্টর আমাকে বিলেত পাঠাচ্ছে একটা শর্তে। তার একমাত্র মেয়ে মল্লিকাকে বিয়ে করতে হবে। অবশ্য আমি বলেছিলাম যে বর্তমানে আমার স্ত্রী আছেন—তিনি বললেন—ডিভোর্স করতে। রাণী, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কোনদিন নষ্ট হবে না। শুধু একটা সই-য়ে জীবনের সব মুহূর্তগুলো মুছে ফেলা যায় না। নিশ্চয়ই তুমি আমার মঙ্গল চাও—অবশ্য বিলেতে থাকাকালীন তোমার যাতে কষ্ট না হয় তার জন্যে মাসে ২০০৲ টাকা খরচ দেবার ব্যবস্থা আমি করে যাবো। তারপর মাত্র দু'বছর। দু'বছর পর আমি বিলেত-ফেরত ইঞ্জিনীয়র!

রাণী ॥ আমি জানতাম না— সম্মানের প্রতি তোমার এত লোভ আছে।

রাজা ॥ রাণী, জীবনে বাঁচতে গেলে লোভ থাকবেই থাকবে। জীবনের পূর্ণতা আসে টাকায়—টাকা যোগায় সম্মান আর ডিগ্রি—অন্ততঃ আজকের সমাজে।

রাণী ॥ এই সব নতুন কথা আমি তোমার মুখে কখনো শুনিনি। আজ শুনলাম—তোমাকে আমি ভালবেসেছি—আজও বাসি এবং চিরকাল বাসবোও। তুমি যেখানে থাকো তোমার সম্মান যশ নিয়ে তুমি সুখে থেকো—তোমার হয়ে দূর থেকে আমি ভগবানের কাছে তোমার সুখ প্রার্থনা করবো। কলমটা দাও [কলম দিয়ে সই করতে রাণীর বুক যেন ফেটে যায়।]

রাজা ॥ রাণী, তুমি বুঝছো না কেন—এ সমাজে শুধু বাঁচাটাই বড় প্রশ্ন নয়। বাঁচার চেয়েও অনেক কিছু আছে– যার জন্যে দেখছো না মানুষের জীবনগুলো। চারিদিকে দারিদ্র্য—মানুষ বাইরের টুকুকে পুষে রেখে ব্যক্তিত্ব বিক্রি করে দিচ্ছে, তাই—মানে—রাণী তুমি বুঝতে চেষ্টা করো।

রাণী ॥ না—না—তুমি আমায় বুঝিও না—বোঝাতে চেষ্টা করো না। বোঝাতে হবে না। —আমি বুঝবো না। তুমি তোমার মান সম্মান আভিজাত্য নিয়েই থাক—

[রাণী সবেগে ঘর ছেড়ে চলে যায়।]

রাজা ॥ রাণী—রা-নী ! যেও না—শোনো—

[রাজাও রাণীকে অনুসরণ করে।]

? ১—কি ভাই ! এবার তুমি হাসলে না যে—একেবারে চুপ-চাপ যে ! বল এবার রাজত্বটা কার ?

? ২—না ভাই, আমি হার স্বীকার করলাম। এ রাজত্ব তোমারই—।

? ১—ঠিক হ'ল না। একটুতেই তুমি এতবড় হারটা স্বীকার করলে কি করে?

? ২—কোনদিন হারিনি কি না।

? ১—তা'হলে স্বীকার করছো—এ জগতে তুমিও আছ আমিও আছি। এত তোড়জোড়ের কোন দরকার ছিল না। নেহাৎ তোমার দম্ভটা একটু চাপা দেবার জন্যেই আমাকে এখানে এই ক'টা দিন থাকতে হ'ল।

? ২—তোমার কাছে একটা অনুরোধ আছে।

? ১—বল।

? ২—আমি যেহেতু হার স্বীকার করলাম, সেই কারণে এ রাজত্বের ভার তুমি নিজের হাতে নাও।

? ১—মাথা খারাপ! বুড়ো হয়েছি। তারচেয়ে বরং তোমার কাঁচা বয়েস—অনেক কিছু করবার শক্তি আছে—এই যৌবনে তুমি এ রাজত্বের ভার নাও। আমার সময় হয়ে এসেছে। এবার আমি ছুটি নেব।

? ২—সে কি করে হয়!

? ১—হয়। তুমি যে-রাজত্বের—রাজা সেই দেশেরই আজ দরকার। আমি হচ্ছি মরা রাজত্বের মালিক—এখন আমার ছুটি। আমার রাজত্বে যে হতভাগাগুলো আছে, তাদেরকে তোমার রাজত্বে স্থান দিয়ে একটা নতুন ছন্দোময় জগৎ গড়ে তোলা—যেখানে আমি থাকবো না—সেখানকার প্রত্যেকটি মানুষও তোমার মত প্রাণ খুলে যেন হাসতে পারে। হে রাজা! সেই আশা নিয়েই আমি বিদায় নিলাম।

[মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেল। পর্দা পড়ে যেতেই নাট্যগৃহ আলোকিত হয়ে উঠলো।]

নিবেদন ॥

'সপ্তক'—সংকলনের যে-কোন নাটক যে-কোন সংস্থা অভিনয় করতে পারেন। তবে তার আগে নাট্যকারের অনুমতি প্রয়োজন। অনুমতি নেবার ঠিকানা :—

১। **প্রতিমা-পুস্তক**

১৩৯-ডি-১, আনন্দ পালিত রোড, কলিকাতা—১৪

১৩, কলেজ রো, কলিকাতা—৯

২। **নাট্যকার**

৪৪, **শরৎ** চ্যাটার্জী রোড, বরাট কলোণী, কলিকাতা—২৮।

—০)*(০—